# মিরেকলস অব দ্য কোরআন

## ( কোরআনের অলৌকিকতা)

নিশ্চয়ই এ কোরআন রাব্বুল আলামীনের নাযিলকৃত

( কোরআন,   ২৬ : ১৯২)

**মূল :   হারুন ইয়াহিয়া**

**ভাষান্তর : ডাঃ উম্মে কাউসার হক**

# এই বইটি মুস্তাবসেরিন বিশ্ব কেন্দ্র ওয়েব সাইট কর্তৃক আপলোড করা হয়েছে।

https://al-mostabserin.com/bangla

# বিসমিল্লাহির রাহমানীর রাহীম

## পাঠকের প্রতি

বিবর্তন থিওরীর পতনের জন্য কেন একটি বিশেষ অধ্যায় সংযোজন করা হলো তার কারণ- এই থিওরীটি সব ধরণের আধ্যাত্মবাদ বিরোধী দর্শনের ভিত্তি নির্মান করে। ডারউইনবাদ যেহেতু সৃষ্টির সত্যকে অস্বীকার করে আর এভাবে আল্লাহর অস্তিত্বকেও প্রত্যাখ্যান করে; তাই বিগত ১৪০ বছর যাবৎ এই ডারউইনবাদ বহু লোকের বেলায় বিশ্বাস পরিত্যাগ করতে কিংবা সন্দেহে পতিত হবার কাজ করে যাচ্ছে । তাই এই থিওরী যে একটি প্রবঞ্চণা তা প্রমাণ করা একটি গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব যা কিনা ধর্মের সঙ্গে দৃঢ়ভাবে সম্পর্কিত। তাই এটি অত্যাবশ্যক বা জরুরী যে এই গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব খানা সকলের উপর বর্তায়। আমাদের কিছু কিছু পাঠক হয়তো বা জীবনে একটি মাত্র বই পড়ার সুযোগ পাবেন। তাই এ বিষয়ের সারসংক্ষেপের জন্য একটি অধ্যায় বরাদ্দ করাকেই আমরা উচিৎ বলে মনে করছি।

লেখকের সবখানা বইয়েই বিশ্বাস সম্পর্কিত বিষয়গুলো কোরআনে আয়াতের আলোকে ব্যাখ্যা করা হয়েছে আর মানব সমাজকে আল্লাহ তাআলার বাণীগুলো সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করে এবং সেগুলো অনুসরণ করে জীবন পরিচালনা করার আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে। আল্লাহ্ তাআলার আয়াতসমূহের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সবগুলো বিষয় এমনভাবে খণ্ডন করা হয়েছে যেন তা পাঠকের মনে কোন ধরণের সন্দেহের উদ্রেক না করে কিংবা কোন প্রশ্ন রেখে না যায়। এখানে আন্তরিক, সরল আর সাবলীল রচনাশৈলীর ব্যবহার করা হয়েছে যেন প্রতিটি বয়সের এবং সমাজের প্রত্যেক স্তরের প্রতিটি মানুষ এই বইগুলো সহজেই হৃদয়ংগম করতে পারে। মনে দাগ কেটে যাওয়া এই সহজবোধ্য বৃত্তান্তসমূহ বইখানিকে পাঠকের পক্ষে একটি বার বসে সমাপ্ত করে উঠতে পারাকে সম্ভব করে তুলেছে। এমনকি যারা আধ্যাত্মিক বিষয়টিকে প্রচণ্ডভাবে অস্বীকার করে তারাও এই বইগুলোতে বর্ণিত প্রকৃত সত্য তথ্যগুলো দিয়ে প্রভাবিত হয় আর তাই বইগুলোর বিষয়বস্তুসমূহকে তারা আর অসত্য বা অমূলক বলে প্রতিপন্ন করতে পারে না।

এই বইখানাসহ লেখকের অন্যান্য সব সৃষ্টিকর্মগুলো একাকী পড়া যায় কিংবা দলবদ্ধ হয়ে আলাপচারীতায় আলোচনা করা যেতে পারে। আর পাঠকগণ যারা এই গ্রন্থগুলো হতে সুফল পেতে ইচ্ছুক হন তারা এ অর্থে আলোচনা করাকে খুবই ফলপ্রসূ পাবেন যে, তারা তাদের নিজেদের ভাবনা আর অভিজ্ঞতাগুলো একে অপরের কাছে বর্ণনা করতে সক্ষম হবেন।

তদুপরি একমাত্র মহান আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টির নিমিত্তে লেখা এই বইগুলো বিভিন্ন উপস্থাপনায় ব্যবহার করে আর পঠনের মাধ্যমে ধর্মের এক বিরাট সেবা করা হবে। লেখকের সবগুলো বই দৃঢ় প্রত্যয় উৎপাদন করে (আর বিশ্বাসযোগ্য)। এ কারণেই যারা মানব সমাজকে ধর্ম সম্পর্কে অবহিত করতে ইচ্ছুক তাদের জন্য সবচাইতে কার্যকরী ব্যবস্থা হলো - এই বইগুলি পড়ার ব্যাপারে মানুষকে উৎসাহিত করা।

আশা করা যায় যে পাঠকগণ বইয়ের শেষের পাতাগুলোয় অন্যান্য কিছু বইয়ের নিবন্ধসমূহে কিছু সময় ধরে চোখ বুলিয়ে যাবেন আর আকীদা (বিশ্বাস) সম্পর্কিত বিষয়গুলোর সমৃদ্ধ উৎস গুলো - যা কিনা খুবই উপকারী ও পড়তেও আনন্দদায়ক - সেগুলোর সঠিক মূল্যায়ন করবেন।

এই বইগুলোতে অন্যান্য কিছু বইয়ের ন্যায় আপনি লেখকের ব্যক্তিগত মতামত, সন্দেহপূর্ণ (অনির্ভর যোগ্য) সূত্র হতে নেয়া ব্যাখ্যাবলী, রচনা শৈলী যা পবিত্র বিষয়ের কারণে সম্মান ও গভীর শ্রদ্ধা ও ভয়ের ব্যাপারে অমনোযোগী, হতাশাব্যঞ্জক, সন্দেহ উদ্রেককারী এবং নৈরাশ্যজনক বর্ণনা যা পাঠকের অন্তরে বিচ্যূতির সৃষ্টি করে - এগুলোর কোন কিছুই আপনি পাবেন না।

**লেখক পরিচিতি**

লেখন হারুন ইয়াহিয়া ছদ্মনামে লেখালেখি করছেন। তিনি ১৯৫৬ সালে আংকারায় জন্ম গ্রহন করেন। তিনি ইস্তাম্বুলের মিমার সিনান ইউনিভার্সিটিতে আর্টস আর ইস্তাম্বুল ইউনিভার্সিটিতে দর্শন শাস্ত্রে পড়াশুনা করেন। ১৯৮০ সন থেকে তিনি রাজনৈতিক বিশ্বাস সংক্রান্ত এবং বিজ্ঞান বিষয়ক ব্যাপারগুলো নিয়ে বহু গ্রন্থ প্রকাশ করে আসছেন। গ্রন্থকার হিসেবে হারুন ইয়াহিয়া একটি

সুপরিচিত নাম যিনি বিবর্তনবাদীদের প্রবঞ্চণা, তাদের দাবিসমূহের অসিদ্ধতা আর ডারউইনবাদ এবং রক্তপাতে বিশ্বাসী ভাবাদর্শের মধ্যকার যোগাযোগ সংক্রান্ত বিষয়গুলো ফাঁস করে দিয়ে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বহু গ্রন্থ তিনি লিখেছেন।

তার ছদ্মনাম হারুন ও ইয়াহিয়া এ দুটি নাম নিয়ে গঠিত। দুজন শ্রদ্ধেয় নবীর নাম থেকে এ দুটি নাম নেয়া হয়েছে, যাঁরা অবিশ্বাসীদের বিরুদ্ধে লড়াই করে গেছেন। লেখকের বইগুলোর প্রচ্ছদসমূহে যে সীল রয়েছে তা এদের বিষয়সমূহের সংযোগে প্রতীকি অর্থ বহন করে। এই মোহর আল্লাহ তাআলার সর্বশেষ গ্রন্থ ও বাণী হিসাবে কোরআনকে আর হযরত মুহম্মদ (দঃ) কে সর্বশেষ নবী হিসেবে তুলে ধরে। পবিত্র কোরআন আর সুন্নাহের মাধ্যমে পরিচালিত হয়ে লেখক তাঁর মূখ্য উদ্দেশ্য হিসেবে এটি ধরে নিয়েছেন যে, তিনি যেন অবিশ্বাস জন্মানো ভাবাদর্শগুলোর প্রতিটি মৌলিক বিশ্বাসকে ভুল প্রমাণিত করতে পারেন আর এমনভাবে তিনি তারঁ শেষ কথা বলে দিতে চান যা কিনা ধর্মের বিরুদ্ধে উত্থাপিত আপত্তিসমূহ সম্পূর্ণরূপে স্তব্ধ করে দিতে পারে। সর্বোচ্চ প্রজ্ঞা ও নৈতিক পূর্ণতা অর্জনকারী নবীর (দঃ) সীল বা মোহরটি লেখকের এই শেষ কথা বলার নিয়ত হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। লেখকের সমস্ত কার্যাবলীই একটি উদ্দেশ্যকে কেন্দ্র করে, যা হলো : মানুষের কাছে কোরআনের বার্তা পৌছে দেয়া, আর আকীদা বা মৌলিক বিশ্বাস সম্পর্কিত বস্তুগুলো যেমন : আল্লাহর অস্তিত্ব, তারঁ একত্ব ও পরকাল - এগুলো সম্পর্কে চিন্তা করতে মানুষকে উদ্বুদ্ধ করা; আর তাদের বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয়াবলী স্মরণ করিয়ে দেয়া ।

লেখক হারুন ইয়াহিয়া অসংখ্য দেশ যেমন ভারত, ইংল্যান্ড, ইন্দোনেশিয়া, পোল্যান্ড, বসনিয়া, স্পেন, ব্রাজিল ইত্যাদি নানা দেশের পাঠকদের অনুরাগ অর্জন করেছেন। অসংখ্য ভাষায় তার বই অনূদিত হয়েছে। আর ইংরেজী, ফরাসী, জার্মানী, ইতালিয়ান, পর্তুগীজ, উর্দু, আরবী, আলবেনিয়ান, রাশিয়ান, বসনিয়ান, তার্কিশ ভাষায় অনূদিত বইসমূহ পাওয়া যাচ্ছে। (বর্তমানে বাংলা ভাষায়ও গুটিকতেক বই পাওয়া যাচ্ছে)।

অত্যন্ত স্বীকৃত এই সৃষ্টিকর্মগুলো পৃথিবীর সর্বত্র বহুলোকের ক্ষেত্রে আল্লাহতে বিশ্বাস স্থাপন করতে ও অন্যান্য বহু লোকের বেলায় তাদের ঈমানের গভীরতর অন্তর্দৃষ্টি অর্জন করার ক্ষেত্রে নিমিত্ত বা

উপায় স্বরূপ কাজ করছে। এই বইগুলোতে যে প্রজ্ঞা আর আন্তরিক ও সহজবোধগম্য শৈলী ব্যবহৃত হয়েছে তা বইগুলোতে এক স্বতন্ত্র ছোঁয়া রেখে গিয়েছে - ফলে যারা এই বইগুলো পড়ে আর পর্যবেক্ষণ করে তাদেরকে বইগুলো প্রত্যক্ষভাবে নাড়া দেয়। আপত্তিমুক্ত এই লেখাগুলোতে দ্রুত কার্যকারীতা, সুস্পষ্ট ফলাফল, অকাট্যতা, এ সমস্ত গুণাবলীমণ্ডিত বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান রয়েছে। এই বইগুলোতে যে ব্যাখ্যাবলী প্রদান করা হয়েছে তা অবশ্যস্বীকার্য, সুস্পষ্ট এবং আন্তরিক আর এগুলোর সুস্পষ্ট উত্তরে পাঠকগণের মনোন্নয়ন ঘটে। যারা এই বইগুলো পড়বেন আর অত্যন্ত গুরুত্বের সঙ্গে চিন্তা করবেন তাদের পক্ষে আর কখনও বস্তুবাদ দর্শন, নাস্তিকতা আর অন্যান্য যে কোন ধরণের বিকৃত ভাবাদর্শ কিংবা দর্শনকে আন্তরিকভাবে সমর্থন করা সম্ভব হবে না। এমনকি যদিও তারা সমর্থন করেই যায়, এগুলো হবে কেবল ভাবাবেগপূর্ণ জেদেরই ফলাফল : কেননা এই বইগুলো উক্ত ভাবাদর্শগুলোর অত্যন্ত মূল বা ভিত্তি হতেই অসত্য বা অমূলক প্রতিপন্ন করে। হারুন ইয়াহিয়ার লেখা বইগুলোর বদৌলতে সমসাময়িক সব ধরণের অস্বীকারের আন্দোলন আজ আদর্শগতভাবেই পরাজিত হয়েছে।

এতে কোনই সন্দেহ নেই যে, এগুলোর বৈশিষ্ট্যাবলী- এদের প্রতি আল্লাহ প্রদত্ত প্রজ্ঞা ও সহজ বোধ্যতারই ফলস্বরূপ। এটা নিশ্চিৎ যে, লেখক নিজে কখনও গর্ববোধ করেন না; তিনি কেবল আল্লাহর সঠিক পথ সন্ধানের ক্ষেত্রে উপায় হিসেবে সাহায্য করার নিয়ত করেন। অধিকন্তু লেখক তার বইগুলো হতে পার্থিব অর্জনের চেষ্টা করেন না। এই লেখক তো নয়ই এমনকি অন্যান্য যারাই এই বইগুলোর প্রকাশ কিংবা পাঠকদের নিকট পৌছে দেয়ার কাজে জড়িত, তারা কেউই পার্থিব কোন লাভ অর্জন করেন না।

এ সমস্ত তথ্যগুলো বিবেচনা করে যারা মানুষের অন্তরের চোখ খুলে দেয়ার আর মানুষকে আল্লাহর আরো অনুগত বান্দা হতে পরিচালনাকারী এই বই গুলো সবাইকে পড়ার ব্যাপারে উৎসাহিত করবেন, তারা নিঃসন্দেহে অমূল্য এক সেবা করে যাবেন।

ইতিমধ্যে, যে বইগুলো মানুষের অন্তরের সংশয় সৃষ্টি করে, ভাবাদর্শগত গোলমালের দিকে পরিচালিত করে এবং মানুষের মনের সন্দেহ দূরীকরণের ব্যাপারে যে বইগুলোর সুস্পষ্টভাবে

কোন শক্তিশালী ও সঠিক প্রভাব নেই, এগুলোর প্রচার করা কেবলই সময় ও শক্তির অপচয় হবে মাত্র। এটা স্পষ্ট প্রতীয়মান যে পথহারা মানুষকে মুক্ত করা ছাড়া শুধুমাত্র লেখকের সাহিত্যিক দক্ষতার উপর জোর দিয়ে রচিত বইয়ের পক্ষে এমন বড় ধরণের প্রভাব ফেলা অসম্ভব। এতে যারা সন্দেহ করে তারা সহজেই দেখতে পাবে যে, হারুন ইয়াহিয়ার বইগুলোর একমাত্র উদ্দেশ্য হলো অবিশ্বাসসমূহ দূর্বল করে দেয়া আর কোরআনের নৈতিক মূল্যবোধগুলো ছড়িয়ে দেয়া। এই সেবাকাজগুলি যে ধরণের সাফল্য, প্রভাব কিংবা আন্তরিকতা অর্জনে সহযোগী তা পাঠকদের বিশ্বাস উৎপাদন হতেই প্রকাশিত হয়।

একটি বিষয় মনে রাখা দরকার : মুসলমানগণ যে অবিরাম নিষ্ঠুরতা, দ্বন্দ্ব আর যে সমস্ত অগ্নিপরীক্ষার সম্মুখীন হচ্ছে তা ধর্মহীন আদর্শগত প্রচারের ফলাফল। এগুলোর অবসান হতে পারে বিশ্বাসহীন ভাবাদর্শের পরাজয়ের মাধ্যমে আর এটা নিশ্চিত করার মাধ্যমে যে, প্রতিটি ব্যক্তি সৃষ্টির রহস্য ও কোরআনের মূল্যবোধ সম্পর্কে এমন জ্ঞান রাখে যেন তারই মাধ্যমে জীবন যাপন করতে পারে। পৃথিবীর এখনকার হাল চাল বিবেচনা করলে যা কিনা মানুষকে সহিংসতা, দুর্নীতি ও দ্বন্দের সর্পিল নিম্নগতির দিকে পরিচালিত করতে বাধ্য করছে - এটা স্পষ্ট হয়ে যায় যে, এই কাজটি আরো দ্রুতগতিতে আর কার্যকারীরূপে করে যাওয়া দরকার। অন্যথায় তখন অত্যন্ত বিলম্ব হয়ে যাবে।

এটা বললে অত্যুক্তি হবে না যে, হারুন ইয়াহিয়ার ধারাবাহিক সৃষ্টিকর্মগুলো অগ্রনী ভূমিকা গ্রহন করেছে। আল্লাহর ইচ্ছায় এই বইগুলো একবিংশ শতাব্দীতে মানুষের জন্য কোরআনে প্রতিশ্রুত শান্তি, রহমত, সুবিচার ও সুখের সন্ধান খুঁজে পাওয়ার উপায় বের করবে।

# বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণ থেকে কোরআনের অলৌকিকতা

**অবতরণিকা**

চৌদ্দশত বছর পূর্বে আল্লাহ তা'আলা মানবজাতির পথচালিকা স্বরূপ কোরআন প্রেরণ করেছিলেন। এ স্বর্গীয় গ্রন্থখানা দৃঢ়ভাবে সমর্থন আর অনুসরণ করে মানবজাতি যেন সঠিক পথে পরিচালিত হয় এ আহ্বান করেছিলেন তিনি। নাযিল হওয়ার দিন থেকে শুরু করে শেষ বিচারের দিন পর্যন্ত এ স্বর্গীয় আর সর্বশেষ বই খানা মানবজাতির জন্য একমাত্র পথচালিকা হিসেবে থেকে যাবে।

পবিত্র কোরআনের অসমকক্ষ আর অতুলনীয় রচনাশৈলী এবং এর মাঝে বিদ্যমান প্রকৃষ্ট, গভীর ও বিস্তৃত জ্ঞানই সুনিশ্চিতভাবে প্রমাণ করে যে এটি মহান আল্লাহ্ তাআলার বাণী। এ ছাড়াও কোরআনের এমন বহু অলৌকিক বৈশিষ্ট্যাবলী রয়েছে যেগুলো প্রমাণ করে যে এটি পরম করুণাময় আল্লাহ তাআলারই নাযিলকৃত গ্রন্থ। এ সমস্ত গুণাবলী বা বৈশিষ্ট্যাদির একটি হলো- অনেকগুলো বৈজ্ঞানিক যথার্থতা বা সত্যতা আজ থেকে ১৪০০ বছর আগেই কোরআনে উল্লেখ করা হয়েছিল- যেগুলো কিনা আমরা সেদিন বিংশ শতাব্দীর প্রযুক্তিমালা দিয়ে আবিষ্কার বা সন্ধান করতে সক্ষম হয়েছি।

অবশ্যই কোরআন কোন বিজ্ঞান বিষয়ক গ্রন্থ নয়। কিন্তু এরপরও বিজ্ঞান সংক্রান্ত বহু বিষয়াদি এ গ্রন্থটিতে অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত রূপে ও সারগর্ভ হিসেবে বর্ণিত রয়েছে- যেগুলো বিংশ শতাব্দীর টেকনোলজী বা প্রযুক্তির মাধ্যমে কেবল সেদিন মানব জাতির সমক্ষে উন্মোচিত হয়েছে। কোরআন যখন নাযিল হয়, সে সময় এ বিষয়গুলো ছিল অজানা, এটি আরো প্রমাণ করে যে কোরআন আল্লাহর বাণী।

কোরআনে বর্ণিত বিজ্ঞান সংক্রান্ত বিষয়াদি বুঝতে হলে আমাদের নজর দিতে হবে সে বিষয়টিতে যে কোরআন যখন নাযিল হয় বিজ্ঞান তখন কোন স্তরে ছিল।

সপ্তম শতাব্দীতে যখন কোরআন নাযিল হয়, সে সময়কার আরব সমাজে বৈজ্ঞানিক বিষয়াদিতে বহুবিধ কুসংস্কার আর ভিত্তিহীন বিশ্বাস প্রচলিত ছিল। মহাবিশ্ব আর প্রকৃতি পরীক্ষা পর্যবেক্ষণ

করার মত কলাকৌশল বিদ্যমান না থাকায় সে সময়কার আদি আরব সমাজের মানুষ তাদের পূর্বপুরুষ থেকে প্রাপ্ত উপাখ্যান সমূহে বিশ্বাস করত। এরই একটি দৃষ্টান্ত উল্লেখ করা যায় যে, পৃথিবীর উপরিস্থিত আকাশই ধারণ করে আছে পর্বতসমূহকে। তাদের বিশ্বাস ছিল যে, পৃথিবী সমতল (গোলাকার নয়); আর পৃথিবীর- দু প্রান্তে রয়েছে উঁচু, উঁচু পর্বতমালা, ধারণা করা হত যে পর্বতমালাসমূহ স্তম্ভের ন্যায় পৃথিবীর উপরিস্থিত খিলান আকৃতির আকাশকে ধারণ করে আছে।

তবে যাই হোক কোরআন নাযিল হওয়ায় আরব সমাজের এসব কুসংস্কার দূরীভূত হয়ে যায়। সূরা রাদের দ্বিতীয় আয়াতে বলা হয়েছে : "তিনিই আল্লাহ যিনি কোন প্রকার অবলম্বন বা স্তম্ভের সাহায্য ছাড়াই আকাশসমূহকে সমুন্নত রেখেছেন। ...." পর্বতমালা বিদ্যমান থাকার ফলেই গগনমন্ডল উপরে স্থির থাকতে পারছে- এরূপ বিশ্বাস উক্ত আয়াত দ্বারাই মিথ্যা প্রমাণিত হয়ে যায়। কোরআনে সেই সময়ে অন্যান্য বহু বিষয়াদি সংক্রান্ত অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাবলী প্রকাশিত হয়েছিল যখন তা কারো পক্ষেই জানতে পারার কথা নয়। সে সময় মানুষ জ্যোতির্বিদ্যা, পদার্থবিদ্যা, কিংবা জীববিদ্যা বিষয়ে খুবই অল্প জ্ঞান রাখত। ঠিক তেমনি এক সময়ে মহাবিশ্বের সৃষ্টি, মানব সৃষ্টি, বায়ু মন্ডলের গঠন আর যে সুক্ষ্ম ভারসাম্য পৃথিবীর বুকে জীবের বা প্রাণের টিকে থাকা সম্ভব করে আছে- এ ধরণের বহু বিষয়াদির ব্যাপারে গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাবলী কোরআনে প্রকাশিত হয়েছে।

এখন চলুন আমরা কোরআনে প্রকাশিত বিজ্ঞান সংক্রান্ত কিছু অলৌকিক বিষয়াদির দিকে দৃষ্টিপাত করি।

## মহাবিশ্ব সৃষ্টি

নিম্নের আয়াতটিতে বিশ্বব্রহ্মান্ডের উৎপত্তির কথা বর্ণিত রয়েছে :

*"তিনিই আদি স্রষ্টা আসমান ও জমিনের।" ( কোরআন, ৬ (১০১ :*

পবিত্র কোরআনে প্রদত্ত এ তথ্যটি সমসাময়িক বিজ্ঞানের পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষায় প্রাপ্ত তথ্যাবলীর সঙ্গে সম্পূর্ণরূপে সংগতিপূর্ণ । আজ জ্যোতির্বিদ্যা যে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে পৌছেছে তা হলো- বস্তু আর সময়ের- পরিধিসহ গোটা মহাবিশ্ব অস্তিত্ত্বে এসেছে বিরাট এক বিস্ফোরণের মাধ্যমে- যা কিনা খুব তড়িৎ গতিতে ঘটেছিল। মহাবিস্ফোরণ ( Big Bang) নামের এই ঘটনাটি একটিমাত্র ক্ষুদ্র বিন্দুর বিস্ফোরণের ফলে মহাবিশ্ব অস্তিত্বহীন অবস্থা থেকে অস্তিত্ত্বে এসেছে। বিশ্ব ব্রহ্মান্ডের সৃষ্টি আর কিভাবে তা অস্তিত্ত্বে এসেছে- এ ব্যাপারে আধুনিক বিজ্ঞান পরিষদ একই মত পোষণ করে যে- মহাবিস্ফোরণই মহাবিশ্বের উৎপত্তি আর অস্তিত্ত্বের একমাত্র যৌক্তিক আর গ্রহনযোগ্য ব্যাখ্যা প্রদান করে।

মহাবিস্ফোরণের পূর্বে পদার্থ বা বস্তু বলে কিছূ ছিলনা। এমনি এক অস্তিত্বহীন বা শূণ্যাবস্থা, যেথায় বিদ্যমান ছিল না কোন পদার্থ, না কোন শক্তি, এমনকি সময়ের অস্তিত্ত্ব ছিলনা- যা কেবল অধিবিদ্যামূলক (Metaphysically) কিংবা বিমূর্ত আলোচনায় বর্ণনা করা যায় তেমনি একটি অবস্থা থেকে পদার্থ, শক্তি আর সময়ের সৃষ্টি হয়েছে। এই যে বিষয়টি আধুনিক পদার্থবিজ্ঞানের মাধ্যমে কেবলি সম্প্রতি আবিষ্কৃত হয়েছে- তাই ১৪০০ বছর আগে কোরআন মানবজাতির উদ্দেশ্যে ঘোষণা করেছিল।
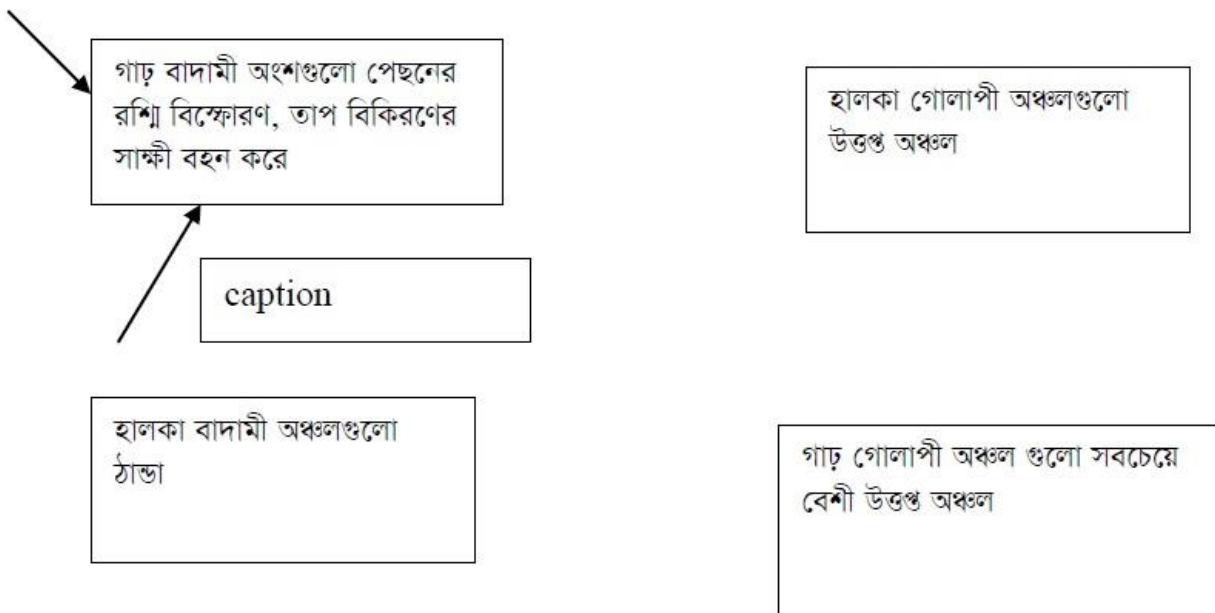
*১৯৯২ সালে নাসা )NASA) Cobe Space স্যাটেলাইট পাঠায় যার সংবেদনশীল সেন্সরগুলো মহাবিস্ফোরণের ঘটনামূলক অবশিষ্টাংশ বা ছিটেফোটা ধরে রাখতে সক্ষম হয়। এই আবিষ্কার মহাবিস্ফোরণের প্রমাণ বহন করে, যা কিনা মহাবিশ্ব যে শূণ্যাবস্থা থেকে সৃষ্ট হয়েছে তারই বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা।*

## মহাবিশ্বের প্রসারণ

১৪০০ বছর পূর্বে যখন জ্যোতির্বিদ্যা ছিল তখনও আদিম অবস্থায়, তখনই আল্লাহ্ তাআলা কর্তৃক নাযিলকৃত কোরআনে বিশ্বব্রহ্মান্ডের প্রসারণের বিষয়টি এমনভাবে বর্ণিত হয় :

*"আর আমি স্বীয় ক্ষমতাবলে আসমানকে সৃষ্টি করেছি আর আমি অবশ্যই নিয়মিতভাবে তা প্রসারিত করছি।" ( কোরআন, ৫১ (৪৭ :*

এই আয়াতটিতে উক্ত "Heavens" শব্দটি দিয়ে কোরআনের বিভিন্ন জায়গায় মহাশূণ্য আর বিশ্বব্রহ্মান্ডকে নির্দেশ করা হয়েছে। এখানে শব্দটি একই অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। অন্য কথায় মহাবিশ্বের প্রসারণের ব্যাপারটি কোরআনে প্রকাশ হয়েছে। আর এটাই সেই পরম সিদ্ধান্ত বা কথা যেখানে বিজ্ঞান আজ পৌছেছে।

বিংশ শতাব্দীর উষালগ্ন পর্যন্ত বিজ্ঞান জগতে এই একটিমাত্র ধারণা প্রচলিত ছিল যে, "মহাবিশ্বের রয়েছে একটি স্থির বা অপরিবর্তনীয় প্রকৃতি বা অবস্থা এবং অননন্তকাল- ধরেই এর অস্তিত্ব রয়েছে।" অর্থাৎ এর কোন শুরু নেই, পরিবর্তনও নেই। যাই হোক প্রকৃতপক্ষেই মহাবিশ্বেরও যে একটি সূচনা বা আরম্ভ ছিল আর এটি ক্রমাগতই "প্রসারিত" হচ্ছে- আধুনিক প্রযুক্তিসমূহ দ্বারা গবেষণা, পর্যবেক্ষণ আর গণনা চালিয়ে এ তথ্যটি পাওয়া গেছে।

বিংশ শতাব্দীর গোঁড়ার দিকে রাশিয়ান পদার্থবিদ Alexander Friedmann এবং বেলজিয়ামের মহাবিশ্ববিষয়ক বিজ্ঞানী Georges Lemaitre থিওরী দিয়ে বা তত্ত্বগতভাবে গণনা করে দেখেন যে বিশ্বব্রহ্মান্ড বিরামহীনভাবে নিয়তই গতিশীল রয়েছে আর এটি প্রসারিতও হচ্ছে।

১৯২৯ সালে পর্যবেক্ষণমূলক ডাটার মাধ্যমেও এ বিষয়টি প্রমাণিত হয়। আমেরিকান জ্যোতির্বিদ Edwin Hubble একটি টেলিস্কোপ দিয়ে আকাশ পর্যবেক্ষণ করতে গিয়ে আবিষ্কার করেন যে নক্ষত্রপুঞ্জ আর গ্যালক্সিগুলো পরস্পর থেকে ক্রমাগতই দূরে সরে যাচ্ছে । বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডে সবকিছু পরস্পর থেকে দূরে সরে যাচ্ছে, এতেই প্রমাণিত হয় যে এই মহাবিশ্ব নিয়ত প্রসারিত মহাবিশ্ব ।

*মহাবিস্ফোরণের মুহূর্ত থেকেই বিশ্বব্রহ্মান্ড এক বিশাল বেগে ক্রমাগত প্রসারিত হচ্ছে। বিজ্ঞানীগণ মহাবিশ্বের এই প্রসারণকে বাতাসে ফোলানো একটি বেলুনের পৃষ্ঠের সঙ্গে তুলনা করেছেন।*

মহাবিশ্ব যে প্রতিনিয়ত প্রসারিত হচ্ছে- এটির সত্যতা পরবর্তী বছরসমূহের পর্যবেক্ষণ দ্বারা প্রমাণিত হয়। অথচ এই বিষয়টি পবিত্র কোরআনে যে সময়টিতে ব্যাখ্যা করা হয় তখন তা কেউ জানতো না। কেননা কোরআন আল্লাহর বাণী, যিনি সমগ্র বিশ্বব্রহ্মান্ডের সৃষ্টিকর্তা ও শাসনকর্তা।

## আকাশ ও পৃথিবীর বিভক্তি ও পৃথকীকরন

গগনমন্ডলীর সৃষ্টি প্রসঙ্গে আরেকটি আয়াতে নিম্নের উক্তিটি করা হয়েছে :

"অবিশ্বাসীরা কি ইহা লক্ষ্য করে নাই যে আকাশ ও পৃথিবী ওতপ্রোতভাবে মিশে ছিল সংযুক্ত ) (অবস্থায় ছিল, তারপর আমি উভয়কে আলাদা করে দিলাম এবং প্রাণবান সমস্ত কিছু আমি সৃষ্টি করলাম পানি থেকে। তবুও কি তারা ঈমান আনবে না ?" ( কোরআন, ২১ : ৩০)

আরবী অভিধানে রাতক্ব (RATQ) শব্দটি অনূদিত হয়েছে "সেলাইকৃত", "বুননকৃত" শব্দে যার অর্থ "একটি অপরটির সঙ্গে সংযুক্ত বা সংমিশ্রিত হয়ে একাকার অবস্থায় ছিল"। ভিন্ন ভিন্ন দুটি বস্তু মিলে একটি অখণ্ড বস্তু তৈরী করে এটি উল্লেখ করতেই শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে।- "আমি সেলাই খুলে বিযুক্ত করেছি"- এই শব্দ সমষ্টি আরবীতে একটি ক্রিয়াপদ ফাতাক্ (fataqa) দিয়ে প্রকাশ

করা হয়। এই শব্দটি এটাই সূচিত করে যে, কোন কিছু রাতক্ব অবস্থায় পূর্বে ছিল, এখন সেটি ছিঁড়ে গিয়ে ভিন্ন ভিন্ন আলাদা জিনিষ অস্তিত্বে এসেছে। মাটি ভেদ করে একটি বীজ থেকে অংকুর বের হওয়ার কাজেও এই ক্রিয়াপদটি ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

চলুন আমরা হৃদয়ে এ ধারণাটি পোষণ করে আয়াতটির উপর আরেকবার দৃষ্টিপাত করি। এ আয়াতটি অনুসারে প্রথমে পৃথিবী আর গগনমন্ডল সংযুক্ত অবস্থায় রাতক্ব হিসেবে ছিল। এদের একটি অপরটি থেকে বের হয়ে আলাদা হয়েছে (ফাতাক্বা হয়েছে)। আগ্রহের সঙ্গে আমরা যখন মহাবিস্ফোরণের (Big Bang) প্রথম মুহূর্তগুলো স্মরণ করে দেখি, তবে আমরা দেখতে পাই যে, মহাবিশ্বের সমস্ত বস্তু বা পদার্থ একটি মাত্র বিন্দুতে বিদ্যমান ছিল। অন্যকথায় “গগনমন্ডলী ও পৃথিবী”- যখন তখনো সৃষ্টিহয়নি তখন রাতক্ব অবস্থায় ছিল । প্রচন্ড বা ভয়ংকরভাবে বিন্দুটি - যারই ফলে বিদ্যমান সমস্ত বস্তুগুলো- বিস্ফোরিত হয়- ছিন্ন ভিন্ন হয়ে যায় (ফাতাক্বাতে); আর এ প্রক্রিয়াতেই সৃষ্ট হয়েছে সমগ্র বিশ্বব্রহ্মান্ড।

বৈজ্ঞানিকভাবে প্রাপ্ত তথ্যাবলীর সঙ্গে আয়াতটির অভিব্যক্তিগুলো তুলনা করে আমরা দেখতে পাই যে, এরা পরস্পর পরস্পরের সঙ্গে নিখুঁতভাবে সামঞ্জস্যপূর্ণ। যথেষ্ট কৌতুহলের ব্যাপার এটি যে বিংশ শতাব্দীর আগে এই তথ্যগুলো পাওয়া যায়নি।

## কক্ষপথরাজি

পবিত্র কোরআনে যখনই চন্দ্র আর সূর্যের কথা বলা হয়েছে তখনই অত্যন্ত গুরুত্বের সহিত উল্লেখ করা হয়েছে যে, চন্দ্র আর সূর্য দুটিই নির্দিষ্ট কক্ষপথে ঘূর্ণায়মান অবস্থায় রয়েছে।

আর তিনিই সৃষ্টি করেছেন রাত্রি ও দিন এবং চন্দ্র ও সূর্য। সবাই নিজ নিজ কক্ষপথে বিচরণ করে। (কোরআন, ২১ : ৩৩)-

সূর্য যে স্থির অবস্থায় নেই বরং একটি সুনির্দিষ্ট কক্ষপথে বিচরণ করছে এ বিষয়টি আরেকটি আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে : আর সূর্য স্বীয় গন্তব্য স্থানের দিকে চলতে থাকে। এটা পরাক্রমশালী, সর্বজ্ঞের নিয়ন্ত্রণ। (কোরআন, ৩৬ : ৩৮)

এই যে বিষয়সমূহ কোরআনের মাধ্যমে আমরা অবগত হয়েছি সেগুলো আমাদের যুগে জ্যোতির্বিজ্ঞানের পর্যবেক্ষণ দ্বারা উদঘাটিত হয়েছে। জ্যোতির্বিজ্ঞানে অভিজ্ঞজনদের গণনানুসারে সূর্য Solar Apex নামক একটি নির্দিষ্ট কক্ষপথে ঘন্টায় ৭২০, ০০০ কিলোমিটার বেগে Vega নামক একটি নক্ষত্রের দিকে গতিশীল বা ভ্রমণরত রয়েছে। এর অর্থ এই দাড়ায় যে, সূর্য প্রতিদিন গড়ে প্রায় ১৭, ২৮০, ০০০ কিলোমিটার পথ অতিক্রম করে থাকে। সূর্যের সঙ্গে সঙ্গে সূর্যের মাধ্যাকর্ষণজনিত সিস্টেমের আওতায় অন্তর্ভূক্ত অন্যান্য গ্রহ, নক্ষত্রগুলোও একই দূরত্ব অতিক্রম করে। অধিকন্তু বিশ্বব্রক্ষান্ডের সমস্ত নক্ষত্রপুঞ্জ ঠিক অনুরূপভাবে পরিকল্পিত গতিতে চলনশীল রয়েছে।

ঠিক এর মতোই গোটা বিশ্বব্রক্ষান্ড যে একই ধরণের পথ আর কক্ষপথে পরিপূর্ণ তা নিম্নরূপে কোরআনে বর্ণিত রয়েছে :

কসম বহু পথ আর কক্ষপথ বিশিষ্ট আসমানের। (কোরআন, ৫১ : ৭)

*মহাবিশ্বে প্রায় ২০০ বিলিয়ন গ্যালাক্সি রয়েছে, যাদের প্রতিটি ২০০ বিলিয়ন নক্ষত্রপুঞ্জ নিয়ে গঠিত। বেশীর ভাগ নক্ষত্রের রয়েছে গ্রহ আর গ্রহের রয়েছে উপগ্রহ। গগনমন্ডলের সমস্ত বস্তুগুলোই সঠিকভাবে গণনাকৃত কক্ষপথসমূহে ঘুর্ণায়মানরত রয়েছে। মিলিয়ন মিলিয়ন বছর ধরে এদের প্রত্যেকেই নিজ নিজ কক্ষপথে পরস্পরের সঙ্গে সম্পূর্ণ সামঞ্জস্য ও সঠিক বিন্যাস রেখে "ঘুরে" বেড়াচ্ছে। এ ছাড়াও বহু ধুমকেতু রয়েছে যারা তাদের জন্য নির্দিষ্ট কক্ষপথে বিচরণ করে।*

মহাবিশ্বের কক্ষপথরাজি কেবলি এই গগনমন্ডলীর গ্রহ-নক্ষত্রের জন্য নয়। গ্যালাক্সিগুলোও সঠিকভাবে গণনাকৃত পরিকল্পিত কক্ষপথসমূহে বিশাল বেগে বিচরণ করে। এই বিচরণের সময় মহাকাশের কোন বস্তু একটি আরেকটির পথে চলে যায়না কিংবা সংঘর্ষে লিপ্ত হয় না।

*এটা সুনিশ্চিত যে, কোরআন নাযিল হওয়ার কালে এখনকার মতো টেলিস্কোপ আবিষ্কৃত হয়নি, ছিলনা পর্যবেক্ষণের জন্য উন্নত প্রযুক্তি যার সাহায্যে এখন মহাশূণ্যের মিলিয়ন মিলিয়ন জায়গা পর্যবেক্ষণ করা যায়, ছিলনা পদার্থবিদ্যা বা জ্যোতির্বিদ্যার আধুনিক জ্ঞান ভান্ডার। কোরআনে যেমন বলা হয়েছে যে "মহাশূণ্য পথ আর কক্ষপথসমূহে পরিপূর্ণ"- যদিও তখনকার সময় তা নির্ণয়*

*করা সম্ভব ছিল না। অথচ কোরআনে বেশ স্পষ্টভাবে বিষয়টি বর্ণিত রয়েছেকেননা এই - পরাক্রমশালীকোরআন মহা,  মহাজ্ঞানী আল্লাহ তাআলার বাণী।*

## পৃথিবীর গোলাকৃতি

তিনি আসমান ও জমিন সৃষ্টি করেছেন যথাযথভাবে। তিনি রাত্রি দিয়ে দিনকে আচ্ছাদিত করেন এবং দিন দিয়ে রাত্রিকে আচ্ছাদিত করেন। তিনি নিয়মাধীন করেছেন সূর্য ও চন্দ্রকে। প্রত্যেকেই নির্ধারিত সময় পর্যন্ত চলতে থাকবে। জেনে রাখ তিনি পরাক্রমশালী, পরম ক্ষমাশীল। (কোরআন, ৩৯ : ৫)

মহাবিশ্বের বর্ণনা দিতে গিয়ে কোরআনে যে সমস্ত শব্দাবলী ব্যবহৃত রয়েছে- সেগুলো বেশ উল্লেখযোগ্য। "আচ্ছাদিত বা মোড়ানো" অর্থে উপরের আয়াতটিতে যে আরবী শব্দটির ব্যবহার করা হয়েছে সেটি হলো "Takwir"। ইংরেজীতে এর অর্থ "একটি জিনিষ দ্বারা অপর একটি জিনিষকে জড়িয়ে বা মুড়িয়ে দেয়াযা কিনা একটি পোষাকের মতো ভাঁজ করা অবস্থায় গোছানো - রয়েছে।" ( উদারহণত, পাগড়ী যেমন করে পরিধান করা হয়, ঠিক তেমনিভাবে একটি জিনিষ দিয়ে অপরটিকে জড়ানোর কাজে আরবী অভিধানে এ শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছেদিন ও রাত্রি ।( আয়াতটিতে প্রদত্ত এই তথ্য দ্বারা পৃথিবীর - পরস্পরকে জড়িয়ে বা আচ্ছাদিত অবস্থায় রয়েছে আকৃতির সঠিক তথ্যই প্রদান করা হয়েছে। এ অবস্থাটি কেবল সেই অবস্থায় সঠিক হতে পারে যখন পৃথিবীর আকৃতি হয় গোলাকার। এর অর্থ সপ্তম শতাব্দীতে নাযিলকৃত কোরআনে পৃথিবী গোলাকার হওয়ার বিষয়টির ইংগিত দেয়া হয়েছিল।

যাই হোক এটা স্মরণ রাখা উচিত যে মহাবিশ্ব সম্পর্কে সে সময়কার জ্যোতির্বিদ্যার জ্ঞান ছিল ভিন্নরূপ। তখনকার সময় মনে করা হতো যে পৃথিবী একটি সমতল এলাকা আর এ বিশ্বাসের উপর ভিত্তি করেই বিজ্ঞান বিষয়ক সমস্ত গণনা আর ব্যাখ্যাদি দাড় করানো হয়েছিল। অথচ আমরা গত শতাব্দীতে যে তথ্যটি জেনেছি তা কোরআনের আয়াতটিতে অন্তর্ভূক্ত ছিল। যেহেতু কোরআন আল্লাহ তায়ালার বাণী, সেহেতু যখন বিশ্বব্রহ্মান্ডের বর্ণনা দেয়া হয়েছে, তখন সবচাইতে শুদ্ধ আর সঠিক শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে।

## সুরক্ষিত ছাদ

কোরআনে মহান আল্লাহ তাআলা আকাশের একটি অত্যন্ত কৌতুহলকর বৈশিষ্ট্যের প্রতি আমাদের মনোযোগ আকর্ষণ করেছেন :

আর আমি আসমানকে সৃষ্টি করেছি একটি সুরক্ষিত ছাদরূপে, কিন্তু তারা তার নিদর্শনাবলী থেকে মুখ ফিরিয়ে রাখে।- (কোরআন, ২১ : ৩২)

বিংশ শতাব্দীতে বৈজ্ঞানিক গবেষণা দ্বারা আকাশের এ বৈশিষ্ট্যটি প্রমাণিত হয়েছে।

জীবনের অবিরাম গতিধারা বজায় রাখার জন্য পৃথিবীকে ঘিরে যে বায়ুমন্ডল রয়েছে তা বেশ গুরুত্বপূর্ণ কাজ করে যাচ্ছে। যখন বড়, ছোট বহু উল্কা পৃথিবীর দিকে ধেয়ে আসে, তখন বায়ুমন্ডল এদেরকে ভূ- পৃষ্ঠে পতিত হতে দেয় না। এভাবেই পৃথিবীর জীবজগতকে উল্কা পতনের ক্ষতিকর দিক থেকে বাঁচিয়ে দেয় বায়ুমণ্ডল।

তা ছাড়া মহাশূণ্য থেকে জীবিত বস্তু সমূহের জন্য ক্ষতিকর যে রশ্মি নির্গত হয় তাকে ফিল্টার করে বা ছেকেঁ শোধন করে বায়ুমন্ডল। কৌতুহলের ব্যাপারটি হলো এই যে, যে রশ্মিসমূহ জীবের জন্য ক্ষতিকর নয়, বরং উপকারী, যেমন, দর্শনযোগ্য আলো, Near Ultraviolet Light আর বেতার তরঙ্গকেই বায়ুমন্ডল অতিক্রম করতে দেয়। এ সমস্ত রশ্মি জীবনের জন্য অতি প্রয়োজনীয়। Near Ultraviolet Ray, যেটি কিনা কেবল আংশিকভাবে বায়ুমন্ডল কর্তৃক আসতে পারে, তা উদ্ভিদের সালোক সংশ্লেষণ আর সমস্ত জীবসমূহের টিকে থাকার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

সূর্য থেকে যে অতি গাঢ় আল্ট্রভায়োলেট রশ্মি নির্গত হয়, তা বায়ুমন্ডলের ওযোন স্তর দিয়ে ফিল্টার হয়; এভাবে আল্ট্রাভায়োলেট রশ্মির অত্যন্ত সীমিত আর অতি প্রয়োজনীয় অংশ ভূ-পৃষ্ঠে এসে পৌছে।

বায়ুমন্ডলের সুরক্ষার কাজ এখানেই শেষ হয়না। মহাশূণ্যের প্রায় ২৭০ডিগ্রী সেন্টিগ্রেডের মতো বরফ ঠান্ডা তাপমাত্রা থেকেও বায়ুমন্ডল পৃথিবীকে রক্ষা করে থাকে।

জীবনের জন্য প্রয়োজনীয় রশ্মিগুলোকেই বায়ুমন্ডল পৃথিবীতে প্রবেশ করতে দেয়। উদাহরণস্বরূপ, আল্ট্রাভায়োলেট রশ্মি কেবল আংশিক ভাবে আসতে পারে। সালোক সংশ্লেষণের মাধ্যমে উদ্ভিদ সমূহের খাদ্য প্রস্তুতির জন্য আর পরিশেষে সমস্ত জীবকে টিকিয়ে রাখার মতো অত্যন্ত সঠিক পরিমাণই. ( আল্ট্রাভায়োলেট রশ্মি) প্রবেশ করতে পারে।

এ ছবিটিতে দেখানো হয়েছে যে, একটি উল্কা পিন্ড পৃথিবীতে প্রায় আঘাত হানতে যাচ্ছে। মহাশূণ্যে চলমান বস্তুগুলো ভূ- পৃষ্ঠের জন্য ভয়ানক ভীতিকর হতে পারতো। কিন্তু যিনি (আল্লাহ) সবচেয়ে সমন্তিত ভাবে সৃষ্টি করেছেন তিনি সুরক্ষার ছাদও বানিয়েছেন। বিশেষ ধরণের এই ছাদের বদৌলতে বেশির ভাগ উল্কাপিন্ড খণ্ড খণ্ড হয়ে বায়ুমন্ডলে পতিত হয়, কিন্তু তারপরও ভূ- পৃষ্ঠের কোন ক্ষতি করে না।

গগনমন্ডল অবলোকন করতে গিয়ে বেশীরভাগ মানুষই বায়ুমন্ডলের সুরক্ষার বা নিরাপদ রাখার বিষয়টি নিয়ে ভেবে দেখেনা। তারা প্রায় কখনই চিন্তা করেনা যে, যদি বায়ুমন্ডলের এধরণের গঠন না থাকতো, পৃথিবী কি ধরণের জায়গা হতো। উল্কার পতনের ফলে আমেরিকায়, আরিজুনাতে যে বিশাল গর্তের সৃষ্টি হয়েছে তাই দেখাচ্ছে উপরের ছবিটি। বায়ুমন্ডল না থাকলে মিলিয়ন মিলিয়ন উল্কাপিন্ড পৃথিবীতে এসে পড়তো, যার ফলে তা বসবাসের অযোগ্য জায়গা হয়ে যেতো। কিন্তু বায়ুমন্ডলের সুরক্ষার দিকটি পৃথিবীর জীবজগতকে নিরাপদে বসবাস করার সুযোগ দিচ্ছে। নিশ্চয়ই এটি মানুষকে রক্ষা করার জন্য আল্লাহরই একটি সিস্টেম এবং একটি অলৌকিক জিনিষ যা কোরআনে ঘোষণা করা হয়েছে।

সূর্যে বিস্ফোরণের ফলে নির্গত শক্তি যে কি পরিমাণ ক্ষমতা রাখে তা মানবমন কদাচিতই ভাবতে পারে। এর একটিমাত্র বিস্ফোরণ হিরোশিমায় পতিত ১০০ বিলিয়ন এটম বোমার সমতুল্য। বায়ুমন্ডল আর ভ্যান এলেন বেল্টের জন্য এই শক্তির ক্ষতিকর দিক থেকে মহাবিশ্ব নিরাপদ রয়েছে।

*মানব জীবনের জন্য পূর্ণাঙ্গ সামঞ্জস্যপূর্ণ করে সৃষ্ট পৃথিবী থেকে বায়ুমণ্ডলের বাইরে মহাশূণ্যে যদি আমরা সরে যাই, তবে বরফ শীতল ঠান্ডার কবলে পড়বো। মহাশূণ্যের ২৭০ ডিগ্রী সেন্টিগ্রেডের মতো বরফ শীতল ঠান্ডা হতে পৃথিবী নিরাপদে রয়েছে এই বায়ুমন্ডলের জন্য।*
*পৃথিবীর ম্যাগনেটিক ফিল্ড দ্বারা তৈরী ম্যাগনেটোস্ফিয়ার স্তর পৃথিবীকে মহাশূণ্যজাত বস্তু, ক্ষতিকর কসমিক রশ্মি এবং কণাসমূহ থেকে নিরাপদে রাখার জন্য বর্ম হিসেবে কাজ করে। ম্যাগনেটোস্ফিয়ার যার নাম ভ্যান এলেন বেল্টসেটিই উপরের চিত্রে দেখা যাচ্ছে।- পৃথিবী থেকে সহস্র সহস্র কিলোমিটার উপরে অবস্থিত এই বেল্টটি মারাত্মক ক্ষতিকর শক্তি থেকে পৃথিবীর জীব জগৎকে রক্ষা করে যাচ্ছে, নচেৎ মহাশূণ্য থেকে ভয়ানক এই শক্তি পৃথিবীতে এসে পৌছুত। এ সমস্থাবৈজ্ঞানিক তথ্যাদি প্রমাণ করে যে-, বিশেষ এক পদ্ধতিতে পৃথিবী নিরাপদ রয়েছে। গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার হলো যে , ১৪০০ বছর পূর্বে এ আয়াতটি দ্বারা এই নিরাপত্তা ব্যবস্থার কথা জানানো হয়েছে :“আর আমি আসমানকে সৃষ্টি করেছি একটি সুরক্ষিত ছাদরূপে...”*

বায়ুমন্ডল একাই কেবল পৃথিবীকে ক্ষতিকর প্রভাব থেকে রক্ষা করেনা। বায়ুমন্ডলের সাথে পৃথিবীর ম্যাগনেটিক ফিল্ড দ্বারা তৈরী ভ্যান এলেন বেল্ট নামক একটি স্তরও আমাদের গ্রহটিকে সেই সমস্ত ভীতিকর আর ক্ষতিকর রশ্মি বিচ্ছুরণ থেকে রক্ষার প্রয়োজনে বর্ম হিসেবে কাজ করে। সূর্য আর অন্যান্য নক্ষত্র থেকে অবিরত বিচ্ছুরিত এ সমস্ত রশ্মি জীব জগতের জন্য ভয়ানক ক্ষতিকর। ভ্যান এলেন বেল্টটি যদি না থাকতো তবে সূর্যের ভেতরে ঘন ঘন সংঘঠিত বিশাল বিস্ফোরনের শক্তি যা Solar Flare নামে পরিচিত তা পৃথিবীর সমগ্র প্রাণী জগতকে ধ্বংস করে দিতো।
আমাদের জীবনের জন্য ভ্যান এলেন বেল্ট এর গুরুত্বের কথা বলতে গিয়ে ডঃ হিউগ রস কে বলতে হয়েছে :
প্রকৃতপক্ষে সৌর জগতের অন্য যে কোন গ্রহের চাইতে আমাদের পৃথিবীর ঘনত্ব অনেক বেশী। বিশাল নিকেললৌহ স্তর আমাদের বিশাল ম্যাগনেটিক ফিল্ড এর জন্য দায়ী। এই ম্যাগনেটিক

ফিল্ডটিই ভ্যান এলেন রেডিয়েশন বর্মটি তৈরী করেছে যা রেডিয়েশনজনিত গোলাবর্ষণ থেকে ভূ-পৃষ্ঠকে রক্ষা করছে। এই বর্ম বা ঢালটি না থাকলে পৃথিবীতে প্রাণের অস্তিত্ব অসম্ভব হয়ে দাড়াতো। বুধ আরেকটি পর্বতময় গ্রহ যার ম্যাগনেটিক ফিল্ড রয়েছে- এই স্তরের ক্ষমতা পৃথিবীর ভ্যান এলেন বেল্টটির চেয়ে ১০০ গুণ কম। এমনকি শুক্র গ্রহ যেটি আমাদের পাশের গ্রহ যার কোন ভ্যান এলেন বেল্ট নেই। ভ্যান এলেন রেডিয়েশনের এই ঢালটি এক মাত্র পৃথিবীর জন্যই সৃষ্টি করা হয়েছে অনন্যরূপে।[১]

এই বিস্ফোরণগুলোর একটির ফলে যে শক্তি সরবরাহ হয় তা হিরোশিমায় পতিত ১০০ বিলিয়ন এটম বোমার সমতুল্য বলে গণনা ও নির্ণয় করা হয়েছে। বিস্ফোরণের ৫৮ বছর পর পর্যবেক্ষণ করে দেখা গেছে যে, কম্পাসের ম্যাগনেটিক সূচকটি অস্বাভাবিক নড়াচড়া প্রদর্শন করছে। আর পৃথিবীর বায়ুমন্ডলের ২৫০ কিলোমিটার উপরে তাপমাত্রা সহসা বেড়ে গিয়ে ২৫০০ ডিগ্রী সেন্টিগ্রেডে পৌচ্ছেছে।

সংক্ষেপে ভূ- পৃষ্ঠের উপরে উঁচু স্তরে একটি নিখুঁত সিস্টেম কর্মরত রয়েছে। এটি আমাদের বিশ্বের চারিদিক জুড়ে কর্মরত এবং বিশ্বকে বাইরের আসন্ন বিপদ বা আশংকা থেকে রক্ষা করছে। যদিও শত শত বছর পূর্বে আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কোরআনে আমাদের অবহিত করেছেন যে, পৃথিবীর বায়ুমন্ডল একটি সুরক্ষিত ঢাল হিসেবে কাজ করছে। অথচ বিজ্ঞানীগণ কেবল সেদিনই তা জানতে পেরেছেন।

## আকাশের প্রত্যাবর্তন কার্যাবলী

পবিত্র কোরআনে সূরা তারিকের **১১**নং আয়াতে আল্লাহ তাআলা আকাশের প্রত্যাবর্তন কার্যাবলীর কথাটি উল্লেখ করেছেন :

কসম আসমানের, যা থেকে বৃষ্টিপাত হয়। (কোরআন, ৮৬ : **১১**)

কোরআন অনুবাদের বেলায় এই আবর্তনশীল )Cyclicalশব্দটি আরো কটি অর্থ বুঝিয়ে থাকে (; যেমন, “ফেরৎ পাঠানো”, কিংবা “ফিরে আসা” বা “প্রত্যাবর্তন”।

সবারই জানা আছে যে, পৃথিবীকে ঘিরে থাকা বায়ুমন্ডল বেশ কটি স্তর নিয়ে গঠিত। এর প্রতিটি স্তরই জীবনের কল্যানে বিবিধ প্রকার গুরুত্বপূর্ণ ভুমিকা রেখে যাচ্ছে। গবেষণায় উন্মোচিত হয়েছে যে, স্তর গুলোয় যে সমস্ত বস্তু কিংবা রশ্মি এসে পৌছে সেগুলোকে আকাশে কিংবা ভুপৃষ্ঠে ফেরৎ পাঠিয়ে দেয় এই বায়ুমণ্ডল। এখন চলুন পৃথিবীকে পরিবেষ্টনকারী এই স্তরগুলোর- "আবর্তন" বা প্রত্যাবর্তন প্রক্রিয়া কিছু দৃষ্টান্তের মাধ্যমে পর্যবেক্ষন করি।

(১) ভূ- পৃষ্ঠের ১৩- ১৫ কিলোমিটার উপরে ট্রপোস্ফিয়ার নামক স্তরটি- ভূ- পৃষ্ঠ থেকে উত্থিত পানি বাষ্পকে ঘনীভূত করে বৃষ্টিরূপে ফেরৎ পাঠায়।

(২) ২৫ কিলোমিটার উপরিস্থিত ওযোন স্তরটি- মহাশূণ্য থেকে আসা ক্ষতিকর রশ্মি আর আল্ট্রাভায়োলেট রশ্মি উভয়কেই প্রতিফলিত করে মহাশূণ্যেই ফেরৎ পাঠায়।

(৩) আয়নোস্ফিয়ার বেতার তরঙ্গ সম্প্রচারকে অপ্রতিরোধী যোগাযোগকারী উপগ্রহের (Passive Communication Sattelite) ন্যায় প্রতিফলিত করে পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে ফেরৎ পাঠায়। আর এভাবেই তা অতি দূর দূরান্তে ওয়ারলেস যোগাযোগ, রেডিও, টেলিভিশন সম্প্রচারকে সম্ভব করে তুলে।

(৪) ম্যাগনেটোস্ফিয়ার সূর্য ও অন্যান্য নক্ষত্র থেকে নির্গত ক্ষতিকর রেডিও একটিভ কণা ( Radio Active Particle) কে ভূ- পৃষ্ঠে পৌছুবার পূর্বেই মহাশূণ্যে ফেরৎ পাঠায়।

প্রকৃত ব্যাপারটি হলো যে, বায়ুমন্ডলের এই স্তরগুলোর- বৈশিষ্ট্যাবলী যা নিকট অতীতে উন্মোচিত হয়েছে- সেগুলোই পবিত্র কোরআনে শত শত বছর আগে ঘোষিত হয়েছিল- আর এটিই আবারো প্রমাণ করে যে, কোরআন আল্লাহ তাআলারই বাণী ।

*পৃথিবীতে জীবসমূহের বেঁচে থাকার জন্য পানির প্রয়োজন অপরিহার্য। ট্রপোস্ফিয়ার স্তরটি পানি উৎপন্নের কাজে সাহায্য করে; ভূ- পৃষ্ঠ থেকে উত্থিত বাষ্পকে ট্রপোস্ফিয়ার ঘনীভূত করে বৃষ্টি হিসেবে পৃথিবীতে ফেরৎ পাঠায়।*

*ওযোনোস্ফিয়ার এমন একটি স্তর যা ভূ- পৃষ্ঠের জীবসমূহের জন্য ক্ষতিকর হতে পারে এমন সব রশ্মির আগমনে বাধা দেয়। আল্ট্রাভায়োলেট রশ্মির ন্যায় ক্ষতিকর কসমিক রশ্মিগুলোকে*

*মহাশূণ্যে ফেরৎ পাঠিয়ে দিয়ে ওযোনোস্ফিয়ার পৃথিবীর জীবসমূহকে রশ্মিসমূহের ক্ষতিকর প্রভাব থেকে রক্ষা করে থাকে।*

*বায়ুমন্ডলের প্রতিটি স্তরেরই রয়েছে মানব জাতির জন্য উপকারী বৈশিষ্ট্যাবলী। দৃষ্টান্ত স্বরূপ আয়নোস্ফিয়ার স্তরটি কোন নির্দিষ্ট কেন্দ্র হতে সম্প্রচারিত বেতার তরঙ্গকে প্রতিফলিত করে নিম্নে পৃথিবীতে ফেরৎ পাঠায়। এভাবেই স্তরটি দূর- দূরান্তে সম্প্রচারকে সম্ভব করে তুলেছে।*

## বায়ুমন্ডলের স্তর

মহাবিশ্ব সম্পর্কে কোরআনের তথ্যগুলোর একটি হলো যে, আকাশ সাতটি স্তর নিয়ে গঠিত।

তিনি এমন যিনি সৃষ্টি করেছেন তোমাদের কল্যাণের জন্য পৃথিবীর সবকিছু। তারপর তিনি মনোযোগ দিলেন আকাশের প্রতি এবং বিন্যস্ত করলেন তা সাত আসমানরূপে। আর তিনি সর্ববিষয়ে সবিশেষ অবহিত। (কোরআন, ২ : ২৯)

অতঃপর তিনি আসমানের প্রতি মনোনিবেশ করলেন, তখন তা ছিল ধূম্রবৎ। তারপর তিনি তাকে ও পৃথিবীকে বললেন তোমরা উভয়ে আস স্বে :চ্ছায় কিংবা অনিচ্ছায়। তারা উভয়ে বলল : আমরা স্বেচ্ছায় ও সানন্দে আসলাম।

তারপর তিনি আকাশমন্ডলকে দু'দিনে সাত আসমানে পরিণত করলেন এবং প্রত্যেক আসমানে তার জন্য আদেশ প্রেরণ করলেন। আর আমি নিকটবর্তী আসমানকে সুশোভিত করেছি নক্ষত্ররাজি দিয়ে এবং তাকে হেফাজত করেছি। এটা পরাক্রমশালী, সর্বজ্ঞ আল্লাহ্‌র ব্যবস্থাপনা। (কোরআন, ৪১ : ১১- ১২)

কোরআনের বহু আয়াতে যে “Heavens” শব্দটি এসেছে তা দ্বারা পৃথিবীর উপরের আকাশ তথা মহাবিশ্বকে বুঝানো হয়ে থাকে। এ শব্দটির এমন অর্থ হলে দেখা যায় যে পৃথিবীর আকাশ কিংবা বায়ুমন্ডল সাতটি স্তর নিয়ে গঠিত। বাস্তবিকই- এখন জানা গিয়েছে যে, পৃথিবীর বায়ুমন্ডলের রয়েছে

*জীবনের জন্য পয়োজনীয় প্রতিটি বৈশিষ্ট্য রয়েছে পৃথিবীর। এগুলোরই একটি হলো বায়ুমন্ডল, যা জীব জগৎকে রক্ষা করার কাজে বর্ম হিসেবে কাজ করে। আজ এটি একটি প্রতিষ্ঠিত সত্য যে, বায়ুমন্ডল একটির উপর অন্যটি অবস্তিত- এমনতর সাতটি স্তর- নিয়ে গঠিত। ঠিক কোরআনের বর্ণনার মতোই এটি ঠিক সাতটি স্তর- নিয়ে গঠিত। অবশ্যই এটি কোরআনের একটি অলৌকিকত্ব।*

কয়েকটি স্তর যেগুলোর একটি আরেকটির উপর অবস্থিত । অধিকন্তু কোরআনে যেমন বর্ণিত রয়েছে তেমনি ঠিক সাতটি স্তর নিয়ে বায়ুমন্ডল গঠিত। বৈজ্ঞানিক সূত্রমতে বিষয়টি নিম্নরূপে বর্ণিত হয়ে থাকে :

বিজ্ঞানীগণ পর্যবেক্ষন করেছেন যে, বায়ুমন্ডল বিভিন্ন স্তর নিয়ে গঠিত। চাপ ও গ্যাসের প্রকারের মত ভৌত গুণাবলী দ্বারা স্তরসমূহ ভিন্নতা প্রদর্শন করে। ভূ- পৃষ্ঠের সবচেয়ে নিকটতম স্তর- হলো ট্রপোস্ফিয়ার। বায়ুমন্ডলের ৯০ শতাংশ নিয়ে এই স্তর গঠিত। ট্রপোস্ফিয়ারের উপরের স্তরটিকে বলা হয় স্ট্রাটোস্ফিয়ার। ওযোন স্তর স্ট্রাটোস্ফিয়ারেরই একটি অংশ যেখানে আল্ট্রাভায়োলেট রশ্মি শোষিত হয়ে থাকে। স্ট্রাটোস্ফিয়ারের উপরের স্তরটিকে- বলা হয় মেসোস্ফিয়ার।

*মেসোস্ফিয়ারের উপরে থাকে থার্মোস্ফিয়ার। এই স্তরে আয়নে পরিণত গ্যাসগুলো একটি স্তর তৈরী করে যাকে বলা হয় আয়নোস্ফিয়ার। পৃথিবীর বায়ুমন্ডলের সবচেয়ে বাইরের স্তরটি ৪৮০ কিলোমিটার থেকে ৯৬০ কিলোমিটার পর্যন্ত বিস্তৃত। এই স্তরটিকে- বলা হয় এক্সোস্ফিয়ার।*[২]
*১৪০০ বছর পূর্বে যখন আকাশকে একটি অখণ্ড অংশ হিসেবে মনে করা হতো কোরআনে অলৌকিকভাবে তখনি বলা হলো যে এটি সাতটি ভিন্ন ভিন্ন স্তরে গঠিত। অন্য দিকে অতি সম্প্রতি আধুনিক বিজ্ঞান এ সত্যটি উদঘাটন করেছে যে পৃথিবীকে ঘিরে থাকা বায়ুমন্ডল সাতটি স্তর নিয়ে গঠিত।*

আমরা এই সূত্রে স্তরগুলোর- সংখ্যা যদি হিসেব করে দেখি তবে দেখব যে, আয়াতে যেমন উল্লেখ করা হয়েছে ঠিক তেমন করেই বায়ুমন্ডল সাতটি স্তর নিয়ে গঠিত :

১. ট্রপোস্ফিয়ার

২. স্ট্রাটোস্ফিয়ার

৩. ওযোনোস্ফিয়ার

৪. মেসোস্ফিয়ার

৫. থার্মোস্ফিয়ার

৬. আয়নোস্ফিয়ার

৭. এক্সোস্ফিয়ার

এ বিষয়ে আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ অলৌকিক ব্যাপার এ উক্তিতে উল্লেখ করা হয়েছে :

অতঃপর তিনি আকাশ মণ্ডলকে দুদিনে সাত আসমানে পরিণত করলেন এবং প্রত্যেক আসমানে তার জন্য আদেশ প্রেরণ করলেন। ...........। (কোরআন, ৪১ : ২২)

অন্য কথায় বলা যায় যে আয়াতটিতে আল্লাহ তাআলা এটাই উল্লেখ করেছেন যে, তিনি প্রতিটি আসমানের জন্য তাদের করণীয় কাজ বন্টন করে দিয়েছেন। সত্যিই পূর্বের আয়াতগুলোতে আমরা দেখতে পেয়েছি যে, ভূপৃষ্ঠে বসবাসকারী অন্যান্য প্রাণীসহ মানবজাতির উপকারার্থে - প্রতিটি স্তরই অতি প্রয়োজনীয় কাজ করে যাচ্ছে। বৃষ্টি উৎপন্ন করা থেকে শুরু করে ক্ষতিকর রশ্মিসমূহকে বাধা দান, বেতার তরঙ্গ প্রতিফলিত করা, উল্কা পিন্ডসমূহের ক্ষতিকর প্রভাব থেকে বাধা দেয়া বা নিরোধ করা পর্যন্ত বিশেষ বিশেষ কাজগুলো ভিন্ন ভিন্ন স্তর ভিন্ন ভিন্নভাবে সম্পন্ন করে থাকে।

উদাহরণস্বরূপ, বৈজ্ঞানিক সূত্রে এগুলোর একটি কাজের কথা নিম্নে উল্লেখ করা হয়েছে : ভূ-পৃষ্ঠের বায়ুমন্ডলের রয়েছে সাতটি স্তর। সর্বনিম্ন স্তরটি- হলো ট্রপোস্ফিয়ার। বৃষ্টি, বরফ আর বাতাস কেবল এ স্তরটিতেই ঘটে থাকে।[৩]

এটি একটি বড় ধরণের অলৌকিক ব্যাপার যে, এই যে বিষয়গুলো বিংশ শতাব্দীর টেকনোলজী ব্যতীত উদঘাটন করা সম্ভব হওয়ার কথা ছিল না, সেগুলোই কোরআনে ১৪০০ বছর পূর্বে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছিল।

## পর্বতমালার কাজ

পর্বতমালার একটি গুরুত্বপূর্ণ ভৌগলিক কার্যাবলীর প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে পবিত্র কোরআনের নিম্নের আয়াত :

আর আমি জমিনের উপর সুদৃঢ় পর্বতমালা সৃষ্টি করেছি যাতে তাদের নিয়ে জমিন ঝুঁকে না পড়ে; এবং আমি সেখানে প্রশস্ত প্রশস্ত রাস্তা সৃষ্টি করেছি যেন তারা গন্তব্যস্থলে পৌছতে পারে। (কোরআন, ২১ : ৩১)

*ভূ- পৃষ্ঠের গভীরে নীচে পর্বতমালাসমূহের মূল অংশ রয়েছে। (Earth, Press and Siever, p. ৪১৩)*

*ছকবদ্ধ অবচ্ছেদ পর্বতমালার রয়েছে পেরেকের মতো অংশ যার গভীর মূল মাটিতে প্রোথিত অবস্থায় আছে। )Anatomy of the Earth, Cailleux, p. (220*

*অন্য আরেকটি ছবিতে দেখা যাচ্ছে যে, পর্বতমালার গভীর মূলের কারণে কিভাবে পর্বতসমূহ পেরেকের মতো আকার ধারণ করে। (Earth Science, Tarbuck and Lutgens, p. ১৫৮)*

ভূ- পৃষ্ঠের কম্পন প্রতিরোধে পর্বতমালার যে ভূমিকা রয়েছে সেটি আমরা আয়াতটিতে খেয়াল করেছি। কোরআন যে সময়ে নাযিল হয়, তখন কেউ এ ব্যাপারটি সম্পর্কে অবগত ছিল না। প্রকৃতপক্ষে আধুনিক ভূ- বিজ্ঞানের প্রাপ্ত তথ্যসমূহের মাধ্যমে কেবলি সেদিন এ বিষয়টি প্রকাশ পেল।

এ সমস্ত তথ্যানুসারে, যে ভারী ভারী বড় প্লেটগুলো পৃথিবীর উপরের শক্ত স্তর সৃষ্টি করে, সেগুলোর নড়াচড়া আর সংঘর্ষের ফলেই উৎপত্তি ঘটে পর্বতমালাসমূহের। দুটি প্লেট যখন পরস্পর ধাক্কা খায় তখন শক্তিশালী প্লেটটি অন্য প্লেটের নীচে গড়িয়ে চলে যায়, তখন উপরের প্লেটটি বেঁকে গিয়ে পর্বত ও উঁচু উচুঁ জায়গার জন্ম দেয়। নিম্নের স্তরটি ভূমির নীচে অগ্রসর হয়ে

ভেতরের দিকে এক গভীর প্রসারণের জন্ম দেয়। এর মানে পর্বতের রয়েছে দুটো অংশ, উপরে সবার জন্য দর্শনযোগ্য একটি অংশ যেমন থাকে, তেমনি নীচের দিকে গভীরে এর সমপরিমাণ বিস্তৃতি রয়েছে।

*পর্বতসমূহ ভূমির উপরে ও নিম্নদেশে বিস্তৃত হয়ে পেরেকের ন্যায় ভূ- পৃষ্ঠের বিভিন্ন প্লেটকে দৃঢ়ভাবে আটকে ধরে রাখে। ভূ- পৃষ্ঠের উপরের অংশ বা ক্রাস্ট অবিরাম গতিশীল প্লেট নিয়ে গঠিত। পর্বতগুলোর দৃঢ়ভাবে ধরে রাখার বৈশিষ্ট্যটিই ভূ- পৃষ্ঠের উপরের স্তরকে স্থির রেখে কম্পন প্রতিরোধ করে অনেকাংশে। অথচ এই ক্রাস্টের রয়েছে গতিশীল গঠন।*

বিজ্ঞানের বইগুলোতে পাহাড়ের গঠন বর্ণিত হয়েছে নিম্নরূপে :

মহাদেশগুলোর যে অঞ্চলসমূহ পুরু, যেথায় সারি সারি পর্বতমালা রয়েছে, সেথায় ভূপৃষ্ঠের - শক্ত স্তর বা ক্রাস্ট ম্যান্টলের ভেতরে গভীরে ঢুকে যায়।[৪]

একটি আয়াতে পর্বতমালার এই ভূমিকাকে “পেরেকের” ভূমিকার সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে :

আমি কি জমিনকে করিনি বিছানা সদৃশ ? এবং পাহাড়সমূহকে পেরেকস্বরূপ ? ( কোরআন, ৭৮ : ৬৭)

অন্য কথায় পর্বতমালাগুলো ভূ- পৃষ্ঠের উপরে ও নীচে গভীরে বর্ধিত হয়ে প্লেটগুলোকে তাদেরই সন্ধি বা মিলনস্থরেল স্থিরভাবে ধরে রাখে। এভাবে তারা পৃথিবীর উপরের স্তর বা ক্রাস্টকে দৃঢ়ভাবে এঁটে রাখে আর ম্যাগমা স্তরের উপরে কিংবা প্লেটগুলোর মাঝে ক্রাস্ট এর ভেসে যাওয়াকে প্রতিরোধ করে। সংক্ষেপে আমরা পর্বতমালাকে লৌহের পেরেকের সঙ্গে তুলনা করতে পারি যেগুলো কিনা কাঠের বিভিন্ন টুকরাকে একত্রে আটকে রাখে। পর্বতমালার এরূপ সেটে বা এটে ধরার কাজটি বিজ্ঞান সাহিত্যে Isostasy শব্দ দ্বারা বর্ণিত রয়েছে। Isostasy বলতে যা বুঝায় তা নিম্নরূপ :

Isostasyপৃষ্ঠের নীচে সহজে বক্র হয় এমন পাথর জাতীয় - মাধ্যাকর্ষর্ন জনিত চাপের ফলে ভূ : জিনিষ দ্বারাপৃথিবীর ক্রাস্ট বা উপরিস্তরেরথাকে। সাধারণ ভারসাম্য বজায়- [৫]

পর্বতমালার এই গুরুত্বপূর্ণ কাজটি বহু শতাব্দী পূর্বে কোরআনে উল্লেখ করা হয়েছিল যা কিনা আজ আধুনিক ভূবিজ্ঞানে ও বৈজ্ঞানিক গবেষণা দ্বারা উন্মোচিত হয়েছেএটি আল্লাহ তাআলার - সৃষ্টিতে সর্বোচ্চ বিজ্ঞতারই উদাহরণ।

আর আমি জমিনের উপর সুদৃশ পর্বতমালা সৃষ্টি করেছি যাতে তাদেরকে নিয়ে জমিন ঝুঁকে না পড়ে; এবং আমি সেখানে প্রশস্ত প্রশস্ত রাস্তা সৃষ্টি করেছি যেন তারা গন্তব্যস্তলে পৌছতে পারে।(কোরআন, ২১ : ৩১)

## পর্বতমালার গতিশীলতা

পর্বতগুলোর দিকে তাকালে মনে হয় যেন এরা স্থির, অবিচল। প্রকৃতপক্ষে ব্যাপারটি তা নয়। আসলে প্রতিনিয়তই পর্বতমালা রয়েছে সচল, গতিশীল। এই ব্যাপারটি কোরআনের একটি আয়াতে উল্লেখিত আছে :

আর তুমি পর্বতসমূহকে দেখে অটল- অচল মনে কর, অথচ এগুলো সেদিন মেঘরাশির ন্যায় চলমান হবে। এ হল আল্লাহর সৃষ্টি নৈপুণ্য, যিনি সবকিছুকে করেছেন সুষম- সুসংহত। তোমরা যা কিছু করছ, তিনি তা সম্যক অবগত আছেন। (কোরআন, ২৭ : ৮৮)

পৃথিবীর উপরিস্তর ( Crust(, যার উপরে পর্বতসমূহ অবস্থিত, সে স্তরের)- Crustনড়াচড়াই ( পর্বতমালার গতিশীলতার কারণ । নীচে অধিকতর পুরু আরেকটি স্তর রয়েছে যাকে বলা হয় ম্যান্টল; ম্যান্টলের উপরে ভাসমান রয়েছে এই উপরিস্তরটি(Crust)। এটি ছিল বিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগ, যখন জার্মান বিজ্ঞানী Alfred Wegner ইতিহাসে সর্বপ্রথম প্রস্তাব করেন যে প্রথম যখন পৃথিবীর সৃষ্টি হয়, মহাদেশগুলো একত্রে সংযুক্ত অবস্থায় ছিল। কিন্তু এরপর এরা ভেসে বিভিন্ন দিকে ছড়িয়ে যায়। আর এভাবেই নড়াচড়ার কারণে একটি আরেকটি থেকে দূরে সরে যায়।

Wegner এর মৃত্যুর পঞ্চাশ বছর পর ১৯৮০ এর দশকে ভূ- তত্ত্ববিদগণ Wegner এর এই প্রস্তাবটি সঠিক ছিল বলে বুঝতে পারেন। ১৯১৫ সালে Wegner একটি আর্টিকলে নির্দেশ করেন

যে, প্রায় ৫০০ মিলিয়ন বছর আগে ভূ- পৃষ্ঠের স্থলভাগসমূহ একসঙ্গে সংযুক্ত অবস্থায় ছিল। আর এই বৃহৎ স্থল ভাগটি পৃথিবীর দক্ষিণ মেরুতে ছিল Pangaea নামে।

প্রায় ১৮০ মিলিয়ন বছর পূর্বে Pangaea দুটি ভাগে ভাগ হয়ে বিভিন্ন দিকে ভেসে চলে যায়। এদের মাঝে Gondwana নামে বৃহৎ একটি মহাদেশ ছিল, যাতে বিদ্যমান ছিল আফ্রিকা, অষ্ট্রেলিয়া, এন্টার্টিকা- আর ইন্ডিয়া। দ্বিতীয় অংশটি ছিল Laurasia নামে, যেথায় অবস্থিত ছিল ইউরোপ, উত্তর আমেরিকা আর ইন্ডিয়া বাদে এশিয়া। এই পৃথকীকরনের পর ১৫০ মিলিয়ন বছর ধরে Gondwana আর Laurasia ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভাগে আলাদা হয়ে যায়।

The Movement of the Continent

২০০ মিলিয়ন বছর আগে

বাম দিকের ছবিটি অতীতে মহাদেশগুলোর অবস্থান প্রদর্শন করছে। মহাদেশগুলোর নড়াচড়া এমনভাবেই চলতে থাকবে বলে যদি আমরা ধরে নেই তাহলে মিলিয়ন মিলিয়ন বছর পর এগুলোর অবস্থান হবে ডান দিকের ছবিগুলোতে প্রদর্শিত অবস্থার ন্যায়।

৫০ মিলিয়ন বছর পর পশ্চিমভাগ

১৩৫ মিলিয়ন বছর আগে

৫০মিলিয়ন বছর পর পূর্বভাগ

৬৫ মিলিয়ন বছর পূর্বে

আজ
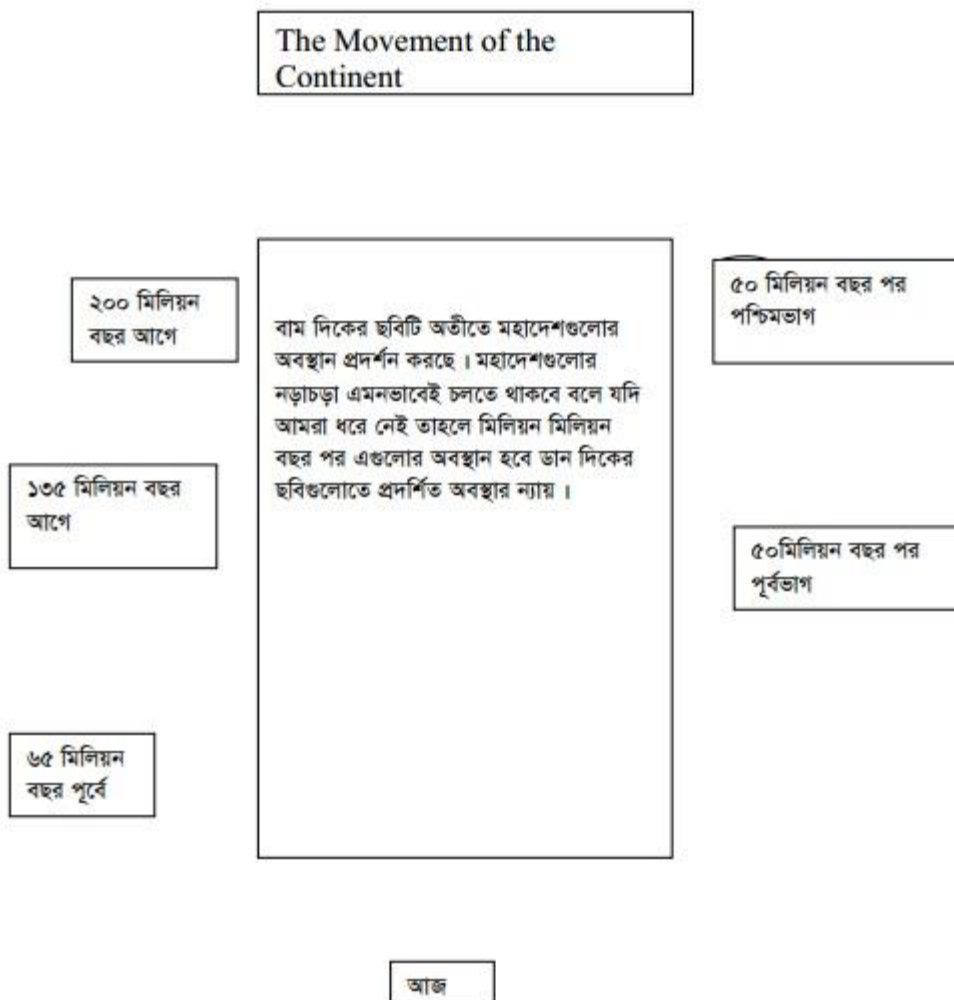
Pangaea বিভক্তির পর আবির্ভূত এই মহাদেশগুলো ভূপৃষ্ঠের উপরে অবিরাম সরে যাচ্ছে- , প্রতি বছরে কয়েক সেন্টিমিটার করে। ইতিমধ্যে পৃথিবীর স্থল ভাগ আর সমুদ্রের অনুপাতও বদলে গিয়েছে।

বিংশ শতাব্দীর গোঁড়ার দিকে চালানো গবেষণায় উদঘাটিত ভূ- পৃষ্ঠের কঠিন আবরণ ক্রাস্ট এর নড়া চড়া বিজ্ঞানীগণ নিম্নরূপে ব্যাখ্যা করেন :

Crust আর Mantle এর সর্বোপরিস্থিত স্তরটি- প্রায় ১০০ কিলোমিটার পুরুত্ব নিয়ে বিভিন্ন খন্ডে বিভক্ত হয় যাদের Plate বলা হয়ে থাকে। ছয়টি বড় বড় আর কয়েকটি ছোট খাট প্লেট বিদ্যমান রয়েছে এখানে। Plate Tectonices নামক থিওরী অনুসারে এই প্লেটগুলো তাদের সঙ্গে মহাদেশ আর সমুদ্রের তলভাগ নিয়ে ভূপৃষ্ঠে নড়ে চড়ে ঘুরে বেড়ায়। পরিমাপ করে দেখা গেছে যে- , মহাদেশগুলোর এই গতি বছরে প্রায় ১৫ সেন্টিমিটার। প্লেটগুলো যেহেতু অবিরত চলমান রয়েছে সেহেতু পৃথিবীর ভূগোলে ধীর গতির পরিবর্তন হবে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ প্রতি বছর আটলান্টিক মহাসাগর একটু একটু করে প্রশস্ত থেকে প্রশস্ততর হচ্ছে।[৬]

এখানে এটি উল্লেখ করার মতো গুরুতপূর্ণ একটি পয়েন্ট আয়াতটিতে আল্লাহ তাআলা : পর্বতমালার নড়াচড়াকে চলমান বা প্রবাহিত হওয়া হিসেবে উল্লেখ করেছেন। আজ আধুনিক বিজ্ঞানীগণও এই গতির জন্য"মহাদেশের প্রবাহ" ( continental driftবহার করেছেন।শব্দটি ব্য ([৭]

প্রশ্নাতীতভাবেই এটি কোরআনের একটি অলৌকিকত্ব। বিংশ শতাব্দীতে সম্প্রতি সেদিন যা বিজ্ঞান দ্বারা আবিষ্কৃত হয়েছে তাই কোরআনে অনেক আগেই ঘোষিত হয়েছিল।

## লৌহে অলৌকিকত্ব

পবিত্র কোরআনে লৌহকে ধাতু হিসেবে বিশেষ গুরুত্বের সঙ্গে উল্লেখ করা হয়েছে। সূরা হাদীদে লৌহ সম্পর্কে আমরা যা অবগত হই তা নিম্নরূপ - :

আর আমি প্রেরণ করেছি লৌহ, যাতে রয়েছে প্রচন্ড শক্তি এবং মানুষের জন্য আরো বহুবিধ উপকার। (কোরআন, ৫৭ : ২৫)

*আয়াতটিতে একমাত্র লৌহের জন্য "প্রেরণ করেছি" শব্দটি বিশেষভাবে ব্যবহৃত হয়েছে। লৌহকে মানুষের উপকারের জন্য দেয়া হয়েছেউপমাগতভাবে এ অর্থেও শব্দটি ব্যবহৃত হতে পারে। - কিন্তু শব্দটির আক্ষরিক অর্থ যখন আমরা বিবেচনায় আনি, যার অর্থ হলো "লৌহকে বাস্তবিকই সশরীরে আকাশ থেকে নিম্নে পাঠানো হয়েছে" তখন আমরা হৃদয়ংগম বা উপলব্ধি করতে পারি যে, আয়াতটি বিশেষভাবে তাৎপর্যপূর্ণ বৈজ্ঞানিক অলৌকিক ব্যাপারের ইংগিত দিচ্ছে।*

কেননা আধুনিক জ্যোতির্বিদ্যায় প্রাপ্ত তথ্যসমূহ উদঘাটন করেছে যে, আমাদের পৃথিবীতে প্রাপ্ত লৌহ মহাশূণ্যের বিশাল বিশাল নক্ষত্রসমূহ থেকে এসেছে।

মহাবিশ্বে বড় বড় নক্ষত্রের কেন্দ্রে ভারী ধাতুগুলো উৎপন্ন হয়ে থাকে। কিন্তু আমাদের সৌর জগতের নক্ষত্রগুলোর নিজেদের লৌহ উৎপন্ন করার মতো যথাযোগ্য গঠন নেই। সূর্যের চেয়েও বড় বড় নক্ষত্র যেখানে তাপমাত্রা কয়েক মিলিয়ন ডিগ্রীতে পৌছে, সেখানেই কেবল লৌহ উৎপন্ন হতে পারে। একটি নক্ষত্রে যখন লৌহের পরিমাণ নির্দিষ্ট সীমার চেয়ে ছাড়িয়ে যায়, তখন নক্ষত্রটি সে পরিমাণ আর ধারণ করে রাখতে পারে না। অবশেষে তা বিস্ফোরিত হয় এমনভাবে যাকে বলা হয় নোভা বা সুপার নোভা। এই বিস্ফোরণের ফলে লৌহ বহনকারী উল্কাগুলো বিশ্বব্রহ্মান্ডে ছড়িয়ে ছিটিয়ে যায় এবং তারা ততক্ষণ পর্যন্ত শূণ্যে চলাফেরা করে যতক্ষন পর্যন্ত মহাশূণ্যজাত পদার্থগুলোর মাধ্যাকষর্ন জনিত বল দ্বারা আকৃষ্ট না হয়।

*এ সবকিছু এটাই প্রমাণ করে যে, লৌহ পৃথিবীতে উৎপন্ন হয়নি বরং তা মহাশূণ্যের বিস্ফোরিত নক্ষত্রগুলো হতে উল্কা দিয়ে বহন করে নিয়ে আসা হয়েছে পৃথিবীতে এবং "আমরা প্রেরণ করেছি লৌহ" আয়াতটিতে যেমন বলা হয়েছে ঠিক তেমনি ভাবেই লৌহকে পাঠানো হয়েছে। এটা স্পষ্ট যে, সপ্তম শতাব্দীতে কোরআন যখন নাযিল হয় তখনকার সময় এ বিষয়টি বিজ্ঞান দিয়ে প্রমাণ করা যায়নি।*

## জোড়ায় জোড়ায় সৃষ্টি

পবিত্র মহান তিনি, যিনি জোড়া জোড়া করে সৃষ্টি করেছেন উদ্ভিদ, মানুষ এবং তারা যাদেরকে জানে না তাদের প্রত্যেককে। (কোরআন, ৩৬ : ৩৬)

*যদিও জোড়া বা যুগল শব্দটি দ্বারা পুরুষ আর নারীর জোড়াই ধারণা করা হয়ে থাকে, ". . . . . . কিন্তু তারা যাদেরকে জানে না তাদের প্রত্যেককে ......." এ উক্তিটির আবার বিস্তৃত পরিসরের ব্যবহার অথবা ব্যাখ্যা রয়েছে। অধুনা এই আয়াতটির একটি ব্যাখ্যার সত্যতা প্রমাণিত হয়েছে।*

ব্রিটিশ বিজ্ঞানী Paul Dirac ১৯৩৩ সালে পদার্থ বিদ্যায় নোবেল পুরষ্কার বিজয়ী হয়েছিলেন। তিনি প্রস্তাব করেন যে, বস্তুসমূহ জোড়ায় জোড়ায় বা যুগল হিসেবে সৃষ্টি হয়েছে। Parite নামের এই আবিষ্কার এটাই বলে যে, প্রতিটি বস্তুরই (Matter) রয়েছে এর বিপরীত প্রতিবস্তু ( Antimatter)। অর্থাৎ প্রতিটি বস্তুই বিপরীত গুণাবলীর প্রতিবস্তুর সঙ্গে জোড়ায় জোড়ায় বা যুগলরূপে বিদ্যমান রয়েছে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ, প্রতিটি বস্তুর পরমাণুর বৈশিষ্ট্যের ঠিক উল্টো বৈশিষ্ট্য বহন করে তারই প্রতিবস্তু। অর্থাৎ বস্তুর উল্টো প্রতিটি প্রতিবস্তুর রয়েছে ধনাত্মক বিদ্যুৎবাহী ইলেকট্রন আর ঋণাত্মক বিদ্যুৎবাহী প্রোটন। এক বৈজ্ঞানিক সূত্রে বিষয়টি নিম্নরূপে বর্ণিত রয়েছে :

*"প্রতিটি কণারই )Particle) বিপরীত বিদ্যুৎবাহী প্রতিকণা (Anti-particle- বিদ্যমান রয়েছে (আর অনিশ্চিত সম্পর্ক এটাই আমাদের বলে যে, জোড়ায় জোড়ায় বা যুগলের সৃষ্টি বা ধ্বংস শূণ্যে সকল সময় সকল স্থানে ঘটে থাকে।"*[৮]

## সময়ের আপেক্ষিকতা

আজ সময়ের আপেক্ষিকতা একটি প্রমাণিত সত্য। বিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকের বছরগুলোয় এ বিষয়টি বিজ্ঞানী আইনষ্টাইনের আপেক্ষিকতার থিওরী বা তত্ত্ব (Theory of Relativity) দ্বারা উন্মোচিত বা প্রমাণিত হয়। অথচ তখনও পর্যন্ত মানুষ জানত না যে সময় আসলে একটি

আপেক্ষিক বা তুলনামূলক ধারণা আর তা পরিবেশ অনুযায়ী পরিবর্তিত হতে পারে। কিন্তু বিখ্যাত বিজ্ঞানী আলবার্ট আইনষ্টাইন এই বিষয়টি প্রকাশ্যে আপেক্ষিকতার থিওরী দিয়ে প্রমাণ করে দেখান। তিনি প্রমাণ করেন যে, সময় ভর (mass) আর বেগের (velocity) উপর নিভর্র শীল। মানব জাতির ইতিহাসে এর আগে আর কেউ এ বিষয়টি পরিষ্কারভাবে প্রমাণ বা প্রকাশ করতে পারেননি।

অথচ ভিন্নভাবে পবিত্র কোরআনে এ বিষয়টি অন্তর্ভূক্ত রয়েছে যে, সময় আপেক্ষিক। বিষয়টি সম্পর্কে কয়েকটি আয়াত যা বলে তা নিম্নরূপ :

আর তারা আপনাকে আযাব ত্বরান্বিত করার জন্য তাগাদা করছে। অথচ আল্লাহ কখনও তাঁর ওয়াদা ভঙ্গ করেন না। নিশ্চয় আপনার রবের কাছে একদিন তোমাদের গণনার এক হাজার বছরের সমান। (কোরআন, ২২ : ৪৭)

*সময়ের ধারণাটি সম্পূর্ণরূপে নিভর্র করে যে সময়টি উপলব্ধি করছে তার উপর। কোন একটি নির্দিষ্ট সময় একজনের কাছে স্বল্প সময় হিসেবে অনুভূত হতে পারে যেখানে এটিই আবার আরেকজনের কাছে মনে হতে পারে লম্বা সময়। এখানে কে সঠিক সেটি জানতে হলে ঘড়ি আর কেলেন্ডারের মতো কিছু জিনিষ রাখা দরকার। এগুলো ছাড়া সঠিকভাবে সময় নির্ণয় করা অসম্ভব।*

তিনি আসমান থেকে জমিন পর্যন্ত যাবতীয় বিষয় পরিচালনা করেন, অবশেষে তা তারঁ সমীপে এমন একদিনে পৌছাবে, যার পরিমাণ হবে তোমাদের গণনানুযায়ী হাজার বছরের সমান। (কোরআন, ৩২ : ৫)

ফেরেশতাগণ এবং রূহ আল্লাহর সমীপে আরোহণ করে যায় এমন এক দিনে, যার পরিমাণ পঞ্চাশ হাজার বছর। (কোরআন, ৭০ : ৪)

কিছু কিছু আয়াতে নির্দেশিত রয়েছে যে, মানুষ ভিন্ন ভিন্ন ভাবে সময়কে উপলব্ধি করে থাকে আর কখনও কখনও খুব সংক্ষিপ্ত বা অল্প সময়কে অতি লম্বা সময় হিসেবে উপলব্ধি করে থাকে ।

পরকালে শেষ বিচারের দিন মানুষ যেমন ধরণের কথাবার্তা বলবে তা এটিরই একটি পরিষ্কার উদাহরণ :

আল্লাহ বলবেন : বছরের গণনায় তোমরা পৃথিবীতে কত সময় অবস্থান করেছিলে ? তারা বলবে : আমরা একদিন অথবা দিনের কিছু অংশ অবস্থান করেছিলাম। অতএব আপনি গণনাকারী ফেরেশতাদের জিজ্ঞেস করুন।

আল্লাহ বলবেন; তোমরা সেখানে অল্প সময়ই অবস্থান করেছিলে যদি তোমরা তা জানতে ? ( কোরআন, ২৩ : ১১২)

প্রকৃত সত্য ব্যাপারটি হলো যে ৬১০ সন থেকে নাযিল হতে থাকা কোরআনে সময়ের আপেক্ষিকতা বিষয়টি অত্যন্ত স্পষ্টভাবে উল্লেখিত হয়েছে- এটি কোরআন পবিত্র গ্রন্থ হওয়ার পক্ষে আরো একটি প্রমাণ।

## বৃষ্টির অনুপাত

বৃষ্টি সম্পর্কে পবিত্র কোরআনে প্রদত্ত তথ্যাবলীর মাঝে একটি হলো যে, পৃথিবীতে বৃষ্টি পরিমিত পরিমাণে পতিত বা বর্ষিত হয়ে থাকে। সূরা যুখরুফে এটি নিম্নরূপে উল্লেখ করা হয়েছে :

আর যিনি আসমান থেকে পানি বর্ষণ করেন নির্দিষ্ট পরিমাণে। তারপর আমি সে পানির সাহায্যে মৃত জমিনকে সঞ্জীবিত করি। এরূপেই তোমাদেরকে বের করে আনা হবে। (কোরআন, ৪৩ : ১১)

*আধুনিক গবেষণায় বৃষ্টির পরিমিত নির্দিষ্ট পরিমাণ আবারো একবার উদঘাটিত হয়েছে। আন্দাজ করা হয়েছে যে, প্রতি সেকেন্ডে ভূমিলিয়ন টন পানি বাষ্প হয়ে উবে যায়। ১৬ পৃষ্ঠ থেকে প্রায়- আর বছরে এ পরিমাণটি দাড়ায়৫১৩ ট্রিলিয়ন টনে। আর পানি বাষ্প হওয়ার পরিমাণ প্রতি বছরে ভূ পৃষ্ঠে পতিত বৃষ্টিধারার পরিমাণের সমান। এর মানে এই দাড়ায় যে, পানি অবিরতই একটি "নির্দিষ্ট পরিমাণে" একটি সুষম চক্রের মধ্যে প্রবাহমান। পৃথিবীর জীবজগৎ এই পানি চক্রের*

*উপরেই নিভর্র শীল। এমনকি মানুষ দুনিয়ায় সমস্ত টেকনোলজী বা প্রযুক্তি ব্যবহার করেও পানির এই চক্রটি কৃত্রিমভাবে পুণরুৎপাদন করতে সমর্থ হবে না।*

এই ভারসাম্যের মাঝে ন্যূনতম পরিবর্তনও পৃথিবীর পরিবেশে মারাত্মক ভারসাম্যহীনতা সৃষ্ট হবে যার ফলে পৃথিবীতে প্রাণের অস্তিত্ত্বের অবসান হতে পারে অর্থাৎ তা পৃথিবীর জীব জগতের মৃত্যুর কারণ হয়ে দাঁড়াবে। কিন্তু তা কখনও ঘটে না, কোরআনে যেমন করে বলা হয়েছে, ঠিক তেমন করেই বৃষ্টি প্রতি বছরে ঠিক একই নির্দিষ্ট পরিমানে বর্ষিত হতেই থাকে।

*প্রতি বছরে যে পরিমাণ পানি বাষ্প হয়ে উবে যায় আর যে পরিমাণ পানি বৃষ্টিধারায় নেমে আসে এ দুটিরই পরিমাণ "ধ্রুব" বা "অপরিবর্তনীয়" : ৫১৩ ট্রিলিয়ন টন। কোরআনে এই পরিমাণটি ঘোষিত হয়েছে এভাবে : "আর যিনি আসমান থেকে পানি বর্ষণ করেন নির্দিষ্ট পরিমাণে........" এই পরিমাণের নিত্যতা বা অপরিবর্তিতা পরিবেশগত ভারসাম্যের অস্তিত্বের জন্য আর এভাবে জীবনের জন্য অতীব গুরুত্বপূর্ণ।*

## বৃষ্টির উৎপত্তি

বৃষ্টি কিভাবে হয় ? এ বিষয়টি দীর্ঘ সময় পর্যন্ত একটি রহস্যময় ব্যাপার ছিল। কেবলি সেদিন যখন আবহাওয়া নির্ণয়ের জন্য রাডার আবিষ্কৃত হলো, তার পর পরই বৃষ্টি উৎপন্ন হওয়ার পর্যায়গুলো জানা গেল।

সে অনুসারে বৃষ্টি উৎপন্ন হয় তিনটি পর্যায়ে। প্রথমতঃ "বৃষ্টির কাঁচামাল" বায়ুপ্রবাহের মাধ্যমে উপরে বাতাসে উঠে আসে, এরপর মেঘমালা উৎপন্ন হয় আর অবশেষে বৃষ্টিকণা দেখা দেয়। কোরআনে প্রদত্ত বৃষ্টি উৎপাদনের বর্ণনাটি ঠিক এ পদ্ধতিরই উল্লেখ করেছে। একটি আয়াতে আল্লাহ তাআলা ব্যাপারটি এভাবে বর্ণনা করেছেন :

আল্লাহ এমন সত্তা যে, তিনি বায়ু প্রেরণ করেন, অতঃপর বায়ু মেঘরাশিকে সঞ্চালিত করে; তারপর তিনি মেঘরাশিকে যেমন ইচ্ছা আসমানের শূণ্যমন্ডলের মধ্যে ইতস্ততঃ ছড়িয়ে দেন,

এবং কখনও তা খণ্ড বিখণ্ড করে দেন; অতঃপর তুমি দেখতে পাও তার মধ্য থেকে বের হয়ে আসে বৃষ্টিধারা। তিনি যখন তাঁর বান্দাদের মধ্যে যাদেরকে ইচ্ছা তা পৌছিয়ে দেন, তখন তারা আনন্দ করতে থাকে। (কোরআন, ৩০ : ৪৮)

এবার চলুন আয়াতে বর্ণিত এই পর্যায়গুলো আরো প্রযুক্তিগতভাবে পরীক্ষা নিরীক্ষা করে দেখি :

**প্রথম পর্যায় :**"তিনি আল্লাহ এমন সত্ত্বা যিনি বায়ু প্রেরণ করেন ..............................." সমুদ্রের ফেনায় উৎপন্ন বায়ুর অগণিত বুদবুদ বিরামহীনভাবে ফেটে গিয়ে জলীয় কণাসমূহকে আকাশের দিকে উৎক্ষিপ্ত করে। এরপর লবণে পরিপূর্ণ এই কণাগুলো বাতাসে বাহিত হয়ে উর্ধ্বে বায়ুমন্ডলে উঠে যায়। এরোসল নামের এই কণাগুলো পানির ফাঁদ হিসেবে কাজ করে আর নিজেদের চারদিকে পানি বাষ্প জড়ো করে উৎপন্ন করে মেঘকণা।

*উপরের ছবিটিতে দেখা যাচ্ছে যে পানির কণাগুলো বাতাসে মুক্ত হচ্ছে। বৃষ্টি তৈরীর প্রথম পর্যায় এটি। এর পর নূতন তৈরী মেঘে পানি কণাগুলো বাতাসে ঝুলে থাকে আর পরে সেগুলো ঘনীভূত হয়ে বৃষ্টি তৈরী করে। এসবগুলো পর্যায়ই কোরআনে বর্ণিত আছে।*

***দ্বিতীয় পর্যায় :****". . . . . . . . . . বায়ু মেঘরাশিকে সঞ্চালিত করে তারপর তিনি মেঘরাশিকে যেমন ইচ্ছা আসমানের শূণ্যমন্ডলের মাঝে ইতস্ততঃ ছড়িয়ে দেন ............"*

বাতাসে ভাসমান লবণ স্ফটিক কিংবা ধূলিকণার চারদিকের পানি কণিকা ঘনীভূত হয়ে উৎপন্ন হয় মেঘমালা। কেননা মেঘমালায় বিদ্যমান পানি কণাগুলো অত্যন্ত ক্ষুদ্র (.০১- .০২মিলি মিটার ব্যাস) হওয়ায় মেঘসমূহ বাতাসে ঝুলে থাকে আর আকাশে ছড়িয়ে পড়ে। এভাবেই মেঘে পরিপূর্ণ হয়ে ঢেকে যায় আকাশ।

***তৃতীয় পর্যায় :****" তুমি দেখতে পাও তার মধ্য থেকে বের হয়ে আসে বৃষ্টিধারা।.................." লবণ স্ফটিক কিংবা ধূলিকণার চতুর্দিকে ঘিরে বিদ্যমান পানিকণাগুলো ঘন ও ভারী হয়ে তৈরি*

*করে বৃষ্টির কণা। এরপর বাতাসের চেয়ে ভারী বৃষ্টিকণাগুলো মেঘ থেকে সরে আসে এবং বৃষ্টিধারা হিসেবে মাটিতে নেমে আসতে শুরু করে।*

আমরা ইতিমধ্যে দেখেছি যে, বৃষ্টি উৎপাদনের প্রতিটি ধাপই কোরআনের আয়াতসমূহে বর্ণিত রয়েছে। অধিকন্তু একদম সঠিক অনুক্রমে বা একটার পর আরেকটি পর্ব অত্যন্ত সঠিকভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। ভূ- পৃষ্ঠে বিদ্যমান অন্যান্য বিষয় বা বস্তুর ন্যায় এ বিষয়টির সবচেয়ে সঠিক ব্যাখ্যা তুলে ধরেছেন মহান আল্লাহ তাআলা আর এভাবেই মানুষ বৃষ্টির পর্যায়গুলো উদঘাটন করার শত শত বছর পূর্বেই আল্লাহ্ তাআলা সে সম্বন্ধে মানুষকে অবগত করেন। অন্য একটি আয়াতে বৃষ্টির উৎপাদন সম্পর্কে নিম্নের তথ্যটি দেয়া হয়েছে :

তুমি কি দেখ না যে, আল্লাহ মেঘমালাকে সঞ্চালিত করেন। তারপর মেঘগুলোকে একত্র করেন এবং পরে তা পুঞ্জীভতূ করেন স্তরে স্তরে; অতঃপর তুমি দেখতে পাও যে, সে মেঘের মধ্য থেকে নির্গত হয় বৃষ্টি। আর তিনি আসমানস্থিত পাহাড়সদৃশ মেঘমালা থেকে বর্ষণ করেন শিলা এবং তা দিয়ে তিনি যাকে ইচ্ছা আঘাত করেন এবং যার উপর থেকে তিনি ইচ্ছা করেন তা দূরে সরিয়ে দেন। সে মেঘের বিদ্যুতের চমক এমন, যেন মনে হয় দৃষ্টিশক্তি প্রায় কেড়ে নেয়। সূরা) নূর (৪৩ :

বিজ্ঞানীগণ মেঘমালার প্রকার পর্যবেক্ষণ করতে গিয়ে বৃষ্টির মেঘ উৎপত্তির এক বিস্ময়কর ফলাফলের মুখোমুখী হন। সুনির্দিষ্ট সিস্টেম ও পর্যায়সমূহের মধ্য দিয়ে তৈরী হয় ও আকার ধারণ করে বৃষ্টির মেঘমালা। পঞ্জু পুঞ্জ মেঘমালা এক ধরণের মেঘ যা নিম্নের পর্যায়গুলোতে ধাপে ধাপে তৈরী হয়।

১নং পর্যায় : মেঘমালাসমূহ সঞ্চালিত হয়ে থাকে বায়ুপ্রবাহের মাধ্যমে মেঘমালা বাহিত হয়ে থাকে।

২নং পর্যায় সংযোগীকরণ :, পুঞ্জীভূতকরণ এর পর বায়ুবাহিত ক্ষদ্র ক্ষুদ্র মেঘমালা একত্রিত হয়ে তৈরি করে বৃহত্তর মেঘ।[৯]

৩নং পর্যায় : স্তুপীকৃত হওয়া বা স্তুপে স্তুপে জমা হওয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মেঘমালা একত্রে সংযুক্ত হলে বৃহদাকার মেঘমালার মাঝে Updraft বেড়ে যায়। এই Updraft মেঘমালার প্রান্তভাগের চেয়ে কেন্দ্রভাগে বেশী জোরালো। এ প্রক্রিয়াতে মেঘগুলো খাড়াখাড়িভাবে বা লম্বালম্বিভাবে জমা হয়ে বাড়তে থাকে। এভাবেই মেঘমালাসমূহ স্তরে স্তরে সজ্জিত হয়। মেঘের এই খাড়া বৃদ্ধি মেঘকে বায়ুমন্ডলের শীতলতর স্থানের দিকে টেনে নিয়ে যায়, সেখানেই উৎপন্ন হয় পানিবিন্দু আর শিলা এগুলোই বৃহৎ থেকে বৃহত্তর হয়ে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় আকাশে। যখন এই শিলা ও পানি বিন্দুগুলি বেশী ভারী হয়, যখন মেঘের এই Updraft আর বহন করতে পারে না তখন মেঘ থেকে এরা মাটিতে পতিত হতে থাকে বৃষ্টি, শিলা ইত্যাদিরূপে।[১০]

*১. পৃথক পৃথক টুকরা মেঘ।*

*২. মেঘগুলো যখন সংযুক্ত হয় তখন এদের ভিতরে Updraft বৃদ্ধি পায়। বৃহদাকারের মেঘ বাড়তে থাকে আর মেঘমালাসমূহ স্তুপীভূত হয়।*

*মেঘের Updraft এর ফলে স্তরে স্তরে মেঘমালা লম্বালম্বিভাবে বৃদ্ধি পায়। লম্বালম্বি বৃদ্ধির ফলে মেঘদেহটিকে বায়ুমন্ডলের অধিকতর ঠান্ডা অঞ্চলে টেনে নিয়ে যায় যেখানে বৃষ্টি কণা, শিলাবৃষ্টি তৈরি হতে থাকে, বৃদ্ধি পেতে থাকে। যখন বৃষ্টিকণা আর শিলাবৃষ্টি অতিরিক্ত ভারী হয়ে যায় তখন মেঘের এই Updraft আর মেঘমালাসমূহকে ধারণ করতে না পারায় মেঘগুলো হতে বৃষ্টি, শিলাবৃষ্টি নীচে পতিত হতে থাকে। ১৪০০ বছর আগে পবিত্র কোরআনে সূরা নূরের ৪৩ নং আয়াতে আল্লাহ তাআলা ঘোষণা করেছিলেন, " . . . . . তারপর মেঘগুলোকে একত্র করেন এবং পরে তা পুঞ্জীভূত করেন স্তরে স্তরে : অতঃপর তুমি দেখতে পাও যে সে মেঘের মধ্য থেকে নির্গত হয় বৃষ্টি।"*

প্লেন, উপগ্রহ. কম্পিউটার এমনতর উন্নত প্রযুক্তি ব্যবহার করে আবহাওয়াবিদগণ কেবলি অতি সম্প্রতি মেঘ উৎপাদন, গঠন আর কার্যাবলী সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে পেরেছেন- এ বিষয়টি

আমাদের অবশ্যই স্মরণ রাখা উচিত। এটি স্পষ্ট যে,  আল্লাহ এমন একটি তথ্য দিয়েছেন যা ১৪০০ বছর পূর্বে মানুষের জানা ছিল না।

*ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মেঘমালাসমূহ (পুঞ্জীভূত মেঘমালা) বায়ু প্রবাহের মাধ্যমে বাহিত হয়ে সংযুক্ত হয় যা নীচের আয়াতটিতে বর্ণিত রয়েছে : ". . . . .  আল্লাহ মেঘমালাকে সঞ্চালিত করেন। তারপর মেঘগুলোকে একত্র করেন এবং পরে তা পুঞ্জীভূত করেন স্তরে- স্তরে......... ।"*

## প্রচুর উৎপাদনশীল বায়ু

বায়ুপ্রবাহের প্রচুর উৎপাদন ক্ষমতা কিংবা উর্বরা ক্ষমতা রয়েছে। এটি বায়ুর একটি বৈশিষ্ট্য। এই বৈশিষ্ট্যটি আর তারই ফলস্বরূপ বৃষ্টি উৎপাদনের কথা বর্ণিত হয়েছে পবিত্র কোরআনের একটি আয়াতে।

*"আর আমিই প্রেরণ করি বায়ুরাশিকে যা বহন করে পানিপূর্ণ মেঘমালাগুলোকে; তারপর আমিই আসমান থেকে বৃষ্টি বর্ষণ করি এবং তা তোমাদের পান করাই।........" ( কোরআন, ১৫ (২২ : মনোযোগ আয়াতটিতে সে বিষয়েই- বৃষ্টিপাতের বা বৃষ্টি উৎপাদনের প্রথম পর্যায় যে বায়ুপ্রবাহ বায়ুপ্রবাহ আর বৃষ্টির - আকর্ষণ করা হয়েছে । বাতাস বা বায়ুপ্রবাহ মেঘমালাকে ভাসিয়ে নিয়ে যায় মধ্যকার এই একটি মাত্র সম্পর্কের কথাই জানা ছিল বিংশ শতাব্দীর শুরুর দিক পর্যন্ত। যাই হোক না কেন আধুনিক আবহাওয়া বিজ্ঞান থেকে প্রাপ্ত তথ্যাগুলো হাতে কলমে দেখিয়ে দিচ্ছে যে বৃষ্টি উৎপাদনের ক্ষেত্রে বাতসের উৎপাদনশীল বা উর্বরা ক্ষমতার ভূমিকা রয়েছে।*

বায়ুর এই উর্বরা বা প্রচুর উৎপাদনশীলতার ক্ষমতা নিম্নরূপে কাজ করে :

*পানির ফেনিল বা ফেনায়িত কার্যাবলীর জন্য মহাসমুদ্র আর সমুদ্রপৃষ্ঠের উপরিপৃষ্ঠ থেকে অগণিত বায়ুর বুদবুদ তৈরী হয়। ঠিক যে মুহূর্তে বুদবুদ গুলি ফেটে যায় তখনই মাত্র ১০০ ভাগের এক ভাগ পরিধির হাজার হাজার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কণিকা বের হয়ে এসে উপরে বাতাসে উত্থিত হয়। "এরোসোল" নামের এই কণিকাগুলো স্থলভাগ থেকে বায়ু বাহিত ধূলিকণার সঙ্গে মিশে ভূমি থেকে উপরে বায়ুমন্ডলের উপরের স্তরগুলোয় উঠে যায়। বাতাসের মাধ্যমে এই কণিকাগুলো আরো উচুঁতে উত্থিত হয়ে পানি বাষ্পের সংস্পর্শে আসে। পানিবাষ্প এই কণিকাগুলোর চারপার্শ্বে ঘনীভূত হয়ে পানিকণিকায় রূপ নেয়। প্রথমে এই পানিকণাগুলো এক সঙ্গে মিশে মেঘ উৎপন্ন করে আর বারিধারা হিসেবে নেমে আসে ধরাতলে।*

দেখা গেল যে, সমুদ্র থেকে বয়ে নিয়ে আসা কণিকাগুলোসহ বাতাসে ভাসমান পানি বাষ্প প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হয় এই বায়ুপ্রবাহের মাধ্যমে আর তারই ফলস্বরূপ বৃষ্টির মেঘ তৈরীতে সাহায্য করে এই বায়ুপ্রবাহ।

যদি বায়ুর এই বৈশিষ্ট্যটি না থাকতো তাহলে বায়ুমন্ডলের উপরের স্তরে কখনো পানি বিন্দু তৈরী হতো না, ফলে বৃষ্টি নামের এই পদার্থটি উৎপন্ন হতো না।

এখানে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি হলো শত শত বছর পূর্বে পবিত্র কোরআনের একটি আয়াতে বায়ুমন্ডলের অতি প্রয়োজনীয় ভূমিকাটি বর্ণিত হয়েছিল তখনই, যখন মানুষ প্রাকৃতিক ব্যাপার স্যাপার খুবই কম জানতো ।........

*উপরের চিত্রটি একটি ঢেউ উৎপাদনের পর্যায়সমূহ প্রদর্শন করছে। পানি পৃষ্ঠের উপরে বাহিত বায়ুপ্রবাহের মাধ্যমেই এই ঢেউগুলো উৎপন্ন হয়। বাতাসের দ্বারা এই পানিবিন্দুগুলো একটি গোলাকার আবর্তে আবর্তিত হতে থাকে। এই প্রবাহের বা গতিশীলতার মাধ্যমে একের পর একটি ঢেউ তৈরী হয়। এই ঢেউগুলো তৈরী করে বুদবুদসমূহ- যারা বাতাসে যায় ছড়িয়ে। বৃষ্টি উৎপাদনের প্রথম পর্যায় এটি। এই পদ্ধতিটিই ঘোষিত হয়েছে এভাবে : "আমিই প্রেরণ করি বায়ুরাশিকে যা বহন করে পানিপূর্ণ মেঘমালাকে তারপর আমিই আসমান থেকে বৃষ্টি বর্ষণ করাই........।"*

## সাগরসমূহ কখনো মিশে যায়না

কেবলি সেদিন সমুদ্রের একটি বৈশিষ্ট্য উদঘাটিত হয়েছে- যা কিনা পবিত্র কোরআনের একটি আয়াতের সঙ্গে সম্পর্কিত, নিম্নে সেই আয়াতটি হলো :

"তিনিই মুক্তভাবে প্রবাহিত করেন দুই দরিয়া, যারা পরস্পর মিলিত হয়ে থাকে, কিন্তু উভয়ের মাঝখানে রয়েছে একটি পর্দা, যা তারা অতিক্রম করতে পারে না। (কোরআন, ৫৫ : ১৯- ২০)

সমুদ্রগুলো পাশাপাশি বয়ে যায়, কাছাকছি আসে কিন্তু কখনোই মিশে যায়না- সাগরগুলোর এই বৈশিষ্ট্যটি সাম্প্রতিক কালে মহাসমুদ্রবিদগণ কর্তৃক উদঘাটিত হয়েছে। Surface Tension বা বহিপৃষ্ঠের টান নামক এক প্রাকৃতিক শক্তির কারণেই প্রতিবেশী সমুদ্রের পানি কখনই একত্রে মিশ্রিত হয় না। বহিপৃষ্ঠের টান নামক এই বলটির সূত্রপাত ঘটে সাগরের পানির ঘনত্বের

তারতম্যের কারণে যা কিনা এক সমুদ্রের পানিকে অপর সমুদ্রের সঙ্গে মিশ্রিত হতে দেয় না। বরং দুটি সমুদ্রের পানির মাঝে একটি পাতলা আবরণ হিসেবে বিদ্যমান থাকে।[১১]

যে যুগের মানুষ পদার্থবিদ্যা, পৃষ্ঠটান কিংবা মহাসমুদ্রবিদ্যা- এগুলো সম্পর্কে কোন জ্ঞান বা ধারণাই রাখতো না, ঠিক সে সময়েই এই বিষয়টি কোরআনে প্রকাশিত হয় এটি একটি বিরাট আশ্চর্যের ব্যাপার।

*ভূমধ্য সাগর আর আটলান্টিক মহাসাগরে রয়েছে বিরাট বিরাট ঢেউ, শক্তিশালী প্রবাহ আর বিদ্যুত। জিব্রাল্টার প্রণালীর মাধ্যমে ভূমধ্য সাগরের পানি আটলান্টিক মহাসাগরে চালিত হয়। কিন্তু যে একটি প্রাচীর বা দেয়াল এদের আলাদা করে রেখেছে সেটির কারণেই এদের তাপমাত্রা, লবণত্ত্ব ও ঘনত্তের মাঝে কোন পরিবর্তন ঘটে না।*

## সমুদ্রের গভীর অন্ধকার আর আভ্যন্তরীণ তরঙ্গমালা

সমুদ্রের গভীর অন্ধকার আর আভ্যন্তরীণ তরঙ্গমালা অথবা তাদের কার্যাবলী অত্যন্ত গভীর সমুদ্রের তলদেশের অন্ধকারের ন্যায়, যাকে আচ্ছন্ন করে তরঙ্গের পর তরঙ্গ, যার উপরে রয়েছে কালোমেঘ; অন্ধকারের উপর অন্ধকার। এমনকি যখন কেউ তার হাত বের করবে, তখন সে আদৌ তা দেখতে পাবে না। আর যাকে আল্লাহ হেদায়েতের নূর দান করেন না তার জন্য কোথাও কোন নূর নেই। (কোরআন, ২৪ : ৪০)

Oceans *নামক বইটিতে গভীর সমুদ্রের সাধারণ পরিবেশের কথা বর্ণিত হয়েছে গভীর সমুদ্র ও : মিটার ও তারও নীচে এক আঁধার পরিবেশ বিরাজ করে। এ ২০০ মহাসমুদ্রসমূহের গভীরে পরিমাণ গভীরতায় প্রায় কোন আলো নেই। আর প্রায় ১০০০ মিটার গভীরতায় একদমই কোন আলো থাকে না।*[১২]

অধুনা সমুদ্রের সাধারণ গঠনপ্রণালী, এর মাঝে বিদ্যমান জীবসমূহের বৈশিষ্ট্যাবলী, এর ঘনত্ব, এর ধারণকৃত পানির পরিমাণ, এর পৃষ্ঠতল আর গভীরতা সম্পর্কে আমরা জানতে

পারি। আধুনিক প্রযুক্তি দিয়ে তৈরী ডুবো জাহাজ ও বিশেষ যন্ত্রাদির মাধ্যমে বিজ্ঞানীগণ এই তথ্যসমূহ পেতে পারেন।

কোন ধরনের বিশেষ যন্ত্রাদির সাহায্য ছাড়া মানুষ সাগরের ৪০ মিটার গভীরে বা আরো নীচে ডুব দিতে বা যেতে পারে না। যেমন, ২০০মিটার গভীরে সমুদ্রের গভীর অন্ধকার অংশে কোন প্রকার সহায়তা ছাড়া বেঁচে থাকতে পারবে না মানুষ । এ সমস্ত কারণেই বিজ্ঞানীগণ সম্প্রতি সমুদ্র সম্পর্কে সুক্ষ্মাতিসুক্ষ্ম তথ্যাদি উদঘাটন করতে সক্ষম হয়েছেন। অথচ ১৪০০ বছর আগেই সূরা নূরে "সমুদ্রের আঁধার" শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছিল। এটা অবশ্যই কোরআনের অলৌকিকত্ব প্রমাণের পক্ষে একটি যুক্তি কেননা এ তথ্যটি কোরআনে এমন সময় প্রদান করা হয়েছে, যখন মানুষ মহাসমুদ্রের গভীরে গিয়ে তথ্যাদি খুঁজে আনার মত কোন যন্ত্রাদির অস্তিত্বই ছিল না।

অধিকন্তু, "তরঙ্গের পর তরঙ্গ, যার উপরে রয়েছে কালোমেঘ; অন্ধকারের উপর অন্ধকার"- সূরা নূরের এ আয়াতটিও কোরআনে বর্ণিত আরেকটি অলৌকিক বিষয় হিসেবে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে থাকে।

সাম্প্রতিক কালে বিজ্ঞানীগণ উদঘাটন করেছেন যে, সেখানে রয়েছে আভ্যন্তরীন তরঙ্গমালা যারা "পানির ভিন্ন ভিন্ন ঘনত্বের স্তরের মাঝে সৃষ্টি হয়ে ভিন্ন ভিন্ন স্তরের ভিন্ন ভিন্ন রূপে অবস্থান করে"। আভ্যন্তরীন তরঙ্গমালা বা ঢেউসমূহ সাগর ও মহাসাগর সমূহের গভীর পানির স্তরগুলো ঢেকে থাকে, কেননা উপরকার পানির চেয়ে ভেতরের পানির রয়েছে বেশী মাত্রার ঘনত্ব।

*আজকের প্রযুক্তি দিয়ে পরিমাপ করে দেখা গেছে যে, সমদ্রপৃষ্ঠে শতকরা ৩৩০ অংশ সূর্যালোক প্রতিফলিত হয়। এর পর আলোর বর্ণালীর প্রায় সাতটি রং প্রথম ২০০ মিটারে শোষিত হয় কেবল নীল আলো ছাড়া। (বামের চিত্রটি) প্রায় ১০০০মিটার তলদেশে একেবারেই কোন আলো নেই। (উপরের চিত্র) ১৪০০ বছর আগে এই বৈজ্ঞানিক সত্যটি সূরা নূরের ৪০নং আয়াতে নির্দেশ করা হয়েছিল।*

*আভ্যন্তরীন  তরঙ্গমালা উপরি পৃষ্ঠের তরঙ্গমালার ন্যায় কাজ করে থাকে। উপরিপৃষ্ঠের তরঙ্গমালার মতো আভ্যন্তরীন  তরঙ্গমালাও ভাঙ্গতে পারে। কোন মানব চক্ষু দিয়ে নয় বরং কোন একটি নির্দিষ্ট অবস্থানের তাপমাত্রা বা লবণের ঘনত্বের পরিবর্তনের পরীক্ষা- পর্যবেক্ষন করেই তবে আভ্যন্তরীন তরঙ্গমালাকে সণাক্ত করা হয়ে থাকে।*[১৩]

উপরের ব্যাখ্যাগুলোর সঙ্গে কোরআনের উক্তিসমূহ সুসামঞ্জস্যপূর্ণ। কোন প্রকার গবেষণা ব্যতীত একজন কেবল সমুদ্রপৃষ্ঠের ঢেউগুলোকেই চর্মচক্ষে অবলোকন করতে পারে। সমুদ্রের আভ্যন্তরীন তরঙ্গ সম্পর্কে অবহিত হওয়া একজনের পক্ষে অসাধ্য ব্যাপার। তারপরেও সূরা নূরে আল্লাহ তাআলা সমুদ্রের বিভিন্ন ঘনত্বে আরেক ধরণের তরঙ্গের প্রতি আমাদের মনোযোগ আকষর্ণ করেছেন। নিশ্চিতভাবেই অতি সাম্প্রতিককালে বিজ্ঞানীগন যা উদঘাটন করতে পেরেছেন,  তা আরো একবার প্রমাণ করে যে,  কোরআনের প্রতিটি কথাই আল্লাহ সোবহানাল্লাহু তাআলার কথা।

## মস্তিস্কের যে অংশটুকু আমদের গতিবিধি নিয়ন্ত্রণ করে থাকে

আর এরূপ করা কখনই উচিত নয়,  যদি সে এরূপ করা থেকে ফিরে না আসে,  তবে আমি তাকে অবশ্যই ললাটের কেশগুচ্ছ ধরে হেঁচড়িয়ে নিয়ে যাব।

যে কেশগুচ্ছ মিথ্যাচারী পাপাচারীর। কোরআন),  ৯৬ ১৫ :- ১৬ (

"যে কেশগুছ মিথ্যাচারী,  পাপাচারীর"- উপরের আয়াতের এই অভিব্যক্তিটি সবচাইতে কৌতুহলকর। সাম্প্রতিক বছরগুলোয় চালানো গবেষণায় প্রকাশ পেয়েছে যে,  মস্তিস্কের প্রিফ্রন্টাল অঞ্চল যা মস্তিস্কের বিশেষ বিশেষ কার্যাবলী নিয়ন্ত্রণ করে থাকে,  তা মাথার খুলির অভ্যন্তরে  সম্মুখভাগে বিদ্যমান। বিজ্ঞানীগণ এই অঞ্চলের কার্যাবলী গত ষাট বছরে উদঘাটন করেছেন,  যা কিনা কোরআনে ১৪০০  বছর আগেই নির্দেশিত হয়েছিল। আমরা যদি মাথার খুলির ভেতরের আর সম্মুখের অংশে দৃষ্টিপাত করি তাহলে আমরা সেরিব্রামের ফ্রন্টাল অঞ্চলটি

খুঁজে পাব। Essentials of Anatomy and Physiology নামের একটি বই, যাতে এই অঞ্চলের কার্যাবলীর উপরের সর্বশেষ গবেষণার ফলাফলের কথা উল্লেখ রয়েছে, সেই বইটি বলে :

পরিকল্পনা করার আর নড়াচড়া শুরু করার জন্য উদ্বুদ্ধতা আর দুরদর্শিতা মস্তিস্কের- সামনের লোবের (Frontal Lobe) সম্মুখের অংশে অর্থাৎ প্রিফ্রন্টাল- অঞ্চলে ঘটে থাকে। এটি সহযোগী কর্টেক্সের অঞ্চল...। [১৪]

বইটি আরো বলে : প্রিফ্রন্টাল অঞ্চলের উদ্বুদ্ধ করার কাজে জড়িত থাকার সম্পর্কে বলতে গিয়ে এটিও ধারণা করা হয় যে, এই অঞ্চলটি আগ্রাসনের কার্যকর কেন্দ্র ।[১৫]

তাই সেরিব্রামের এই অঞ্চলটি পরিকল্পনা, উদ্বুদ্ধ করা আর ভাল ও মন্দ আচরণ শুরু করা এবং সত্যমিথ্যা বলার জন্য দায়ী। এটি পরিস্কার বুঝা গেল যে, "যে কেশগুচ্ছ পাপাচারী, মিথ্যাচারীর"- উক্তিটির সঙ্গে উপরের ব্যাখ্যাটি সম্পূর্ণরূপে সঙ্গতিপূর্ণ । বিজ্ঞানীগণ গত ষাট বছরে যে বিষয়টি আবিষ্কার করেছে, তাই অনেক অনেক বছর আগে মহান আল্লাহ কোরআনে উল্লেখ করেন।

## মানব শিশুর জন্ম

মানুষকে বিশ্বাসের পথে আমন্ত্রণ জানাতে গিয়ে কোরআনে বহু বৈচিত্রময় বিষয়ের উল্লেখ রয়েছে। কখনো বা আকাশ, কখনো প্রাণী জগৎ, কখনো বা উদ্ভিদসমূহকে আল্লাহ মানুষের জন্য সাক্ষ্য হিসেবে বর্ণনা করেছেন। অনেক আয়াতে মানুষকে আহ্বান জানানো হয়েছে নিজেদের সৃষ্টি সম্পর্কে মনোযোগী হতে। প্রায়ই মানুষকে মনে করিয়ে দেয়া হয়েছে যে, সে কিভাবে এ পৃথিবীতে আসল, কি কি পর্যায়ের মধ্যে দিয়ে সে এলো, তার মৌলিক স্বভাব কি ?

আমিই তোমাদের সৃষ্টি করেছি, তবে তোমরা কেন বিশ্বাস করছ না ? তোমরা কি ভেবে দেখেছ তোমাদের বীর্যপাত সম্পর্কে ? তোমরা কি তা সৃষ্টি কর, না আমি তার স্রষ্টা ? (কোরআন, ৫৬ : ৫৭- ৫৯)

বহু আয়াতে মানুষের জন্ম আর জন্মের অলৌকিক অংশগুলোর উপর জোর দেয়া হয়েছে। এই আয়াতগুলোয় কিছু কিছু বিষয়ের তথ্যাদি এত পুংখানুপুংখ যে, সপ্তম শতাব্দীতে বিদ্যমান কোন লোকের পক্ষে জানা অসম্ভব ছিল । এদের কিছু কিছু নিম্নরূপ :

১. সম্পূর্ণ বীর্য থেকে মানুষ সৃষ্টি হয়নি, এর অত্যন্ত ক্ষুদ্রাংশ থেকে তা সৃষ্টি হয়েছে (শুক্রাণু)।

২. পুরুষ থেকেই শিশুর লিংগ নির্ধারিত হয়।

৩. মানুষের ভ্রুণ জরায়ুর গায়ে জোঁকের মত লেগে থাকে।

৪. মানব শিশু জরায়ুতে তিনটি অন্ধকার অঞ্চলে বেড়ে উঠে।

*কোরআন যে সময়ে নাযিল হয়েছে, সে সময়ের মানুষেরা জানতো যে, যৌনমিলনের সময় বের হয়ে আসা বীর্যের সঙ্গে মানব জন্মের মৌলিক বিষয়টির সম্পর্ক রয়েছে। আর নয় মাস সময়সীমা পরে বাচ্চা জন্ম গ্রহন করে যা স্পষ্টভাবেই দৃষ্টিগ্রাহ্য একটি বিষয় ছিল; এটিকে আরো ঘাটিয়ে দেখার প্রয়োজন ছিল না। যাই হোক এই আয়াতগুলোয় বর্ণিত বিষয়গুলো সে সময়ের মানুষের জানার পরিধি থেকে আরো অধিক দূরের ব্যাপার ছিল । যা বিংশ শতাব্দীর বিজ্ঞান কর্তৃক সত্য বলে প্রমাণিত হয়েছে।*

এখন চলুন একের পর এক বিষয়গুলোয় যাই।

## একবিন্দু বীর্য

যৌন মিলনের সময় পুরুষের দেহ থেকে প্রতিবারে ২৫০ মিলিয়ন শুক্রকীট বের হয়ে আসে। মায়ের দেহে শুক্রকীট একটি দুরারূহ যাত্রা চালায় ডিম্বাণুতে পৌছা পর্যন্ত । ২৫০ মিলিয়নের মাঝে কেবলমাত্র এক হাজারটি শুক্রাণু ডিম্বাণু পর্যন্ত পৌছুতে সফল হয়ে থাকে। এই পাঁচ মিনিটের দৌড় শেষে একটি লবণের দানার অর্ধেক আকারের একটি ডিম্বাণু কেবলি একটি শুক্রাণুকে তার ভেতরে প্রবেশ করতে দেয়। তাই মানুষের জন্মের সারংশ পুরু বীর্য নয়, বরং এটি তার একটি ক্ষুদ্রাংশ মাত্র। কোরআনে তা ব্যাখ্যা করা হয়েছে :

মানুষ কি মনে করে যে, তাকে এমনি বেহিসাব ছেড়ে দেয়া হবে? সে কি একবিন্দু শুক্র ছিলনা, যা মাতৃগর্ভে নিক্ষেপ করা হয়েছিল ? ( কোরআন, ৭৫ : ৩৬- ৩৭)
আমরা দেখেছি যে, মানুষ সবটুকু বীর্য থেকে নয় বরং এর অতি অল্প অংশ থেকে মানুষ সৃষ্টি হয়ে থাকে। বিশেষ গুরুত্ব দেয়া এই উক্তিটি এমন একটি বিষয়ের ঘোষণা করছে যা কেবলি আধুনিক বিজ্ঞান কর্তৃক আবিষ্কৃত হয়েছে । তাই এই উক্তিটি যে স্বর্গীয় এটি তারই প্রমাণ।

*বামের ছবিটিতে আমরা দেখি যে, জরায়ুতে বীর্য উৎক্ষিপ্ত হচ্ছে। পুরুষের দেহ হতে বের হওয়া ২৫০মিলিয়ন শুক্রকীটের মধ্যে মাত্র অল্প সংখ্যক শুক্রকীটই ডিম্বাণুর দিকে পরিচালিত হতে পারে। যে হাজার খানেক শুক্রকীট বেঁচে থাকতে পারে তাদের মাঝে মাত্র একটি শুক্রাণু ডিম্বাণুকে নিষিক্ত করতে পারে। মানুষ পুরো বীর্য নয় বরং একটি ক্ষুদ্রাংশ থেকে সৃষ্ট হয়েছে সেটি কোরআনে বর্ণিত হয়েছে "এক বিন্দু শুক্র" হিসেবে।*

## বীযের্র মিশ্রণ

*বীর্য নামক তরল পদার্থটি শুধুমাত্র শুক্রাণু নিয়েই গঠিত নয়। বিপরীতক্রমে এটি আসলে বিভিন্ন তরল পদার্থের মিশ্রণ। এই তরল পদার্থটির বিভিন্ন কাজ রয়েছে। যেমন, এতে শুক্রকীটের শক্তি সরবরাহের জন্য শর্করা থাকে, জরায়ুতে শুক্রের প্রবেশ পথের এসিড নিষ্ক্রিয় করে থাকে এই তরল পদার্থটি, আর শুক্রকীটটির সহজ গতিবিধির জন্য একটি পিচ্ছিল পরিবেশ বজায় রাখে।*
যথেষ্ট কৌতূহলের বিষয় হলো যে, কোরআনে এই বীর্যের কথা উল্লেখিত আছে আর এটিকে তরল পদার্থের মিশ্রণ বলে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে। অথচ আধুনিক বিজ্ঞান কেবল সেদিন এটি আবিষ্কার করলঃ
আমিতো মানুষকে মিশ্র শুক্রবিন্দু থেকে সৃষ্টি করেছি তাকে পরীক্ষা করার জন্য; এ কারণে আমি তাকে করেছি শ্রবণশক্তি সম্পন্ন ও দৃষ্টিশক্তি সম্পন্ন। (কোরআন, ৭৬ : ২)

অন্য একটি আয়াতে বীর্যকে আবার মিশ্র তরল পদার্থ হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে আর মানুষকে যে এই তরলের নির্যাস থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে সেটি জোর দিয়ে বলা হয়েছে।

যিনি অত্যন্ত সুন্দররূপে তাঁর প্রত্যেকটি সৃষ্টিকে সৃজন করেছেন এবং মানুষ সৃষ্টির সূচনা করেছেন কাদামাটি দিয়ে, তারপর তার বংশধরকে সৃষ্টি করেন নগণ্য পানির নির্যাস থেকে। (কোরআন, ৩২ : ৭৮)

*আরবী শব্দ "সুলালার" অনুবাদ করা হয়েছে নির্যাস হিসেবে, যার মানে হলো কোন কিছুর দরকারী অথবা উত্তম অংশ হিসেবে। ব্যঞ্জণার্থেও এর অর্থ একটি অখণ্ড জিনিষের একটি অংশ। এটি দেখিয়ে দেয় যে, কোরআন এক মহাশক্তির কথা যিনি মানুষের সৃষ্টির প্রতিটি অণু পরমাণু অংশ জানেন। আর এই মহাশক্তিশালীই হলেন আল্লাহ, মানুষের সৃষ্টিকর্তা।*

## শিশুর লিঙ্গ

এইতো সেদিন পর্যন্ত ধারণা করা হতো যে, মাতৃকোষ দিয়ে বাচ্চার লিঙ্গ নির্ণয় হয়ে থাকে। অথবা এটুকু অন্তত বিশ্বাস করা হতো যে বাবামা উভয়ের কোষ দিয়ে বাচ্চার লিঙ্গ নির্ণিত হয়। অথচ পবিত্র কোরআন আমাদের ভিন্ন তথ্য দিয়ে থাকে যা বলে যে, "নির্গত শুক্রবিন্দু থেকে" মেয়ে বা ছেলে লিঙ্গ নির্ণিত হয়।

আর তিনিই সৃষ্টি করেছেন জোড়া নর ও নারী শুক্রবিন্দু থেকে যখন তা গর্ভপাত করা হয়। (কোরআন, ৫ : ৪৫- ৪৬)

*ক্রমে উন্নত জেনেটিকস আর মলিকিউলার বায়োলজীর শাখা কোরআনে প্রদত্ত এই তথ্যটি সত্য বলে প্রমাণ করেছে। এখন বুঝা গেছে যে, পুরুষের শুক্রকীট থেকেই লিঙ্গ নির্ণিত হয় আর এ প্রক্রিয়ায় নারীর কোন ভূমিকা নেই। লিঙ্গ নির্ধারণের ব্যাপারে ক্রোমোজোমই প্রধান উপাদান হিসেবে কাজ করে থাকে। সনাক্ত করা গেছে যে ৪৬টি ক্রোমোজমের মাঝে দুইটি মানুষের গঠন প্রকৃতি নির্ণয় করে আর এগুলোকে বলে সেক্স ক্রোমোজোম। পুরুষে এ দুটি ক্রোমোজোম হলো "XY" আর নারীতে এ দুটি "XX"। কেননা এ দুটি ক্রোমোজোমের আকৃতি এ দুটি অক্ষরের*

*মতোই। Y ক্রোমোজোমে বিদ্যমান জীনগুলো পুরুষালী ভাবের কোড বা সংকেত বহন করে আর X ক্রোমোজোম স্ত্রীসুলভ ভাবের কোড বহন করে থাকে।*

*পবিত্র কোরআনে বলা হয়েছে যে, "নির্গত এক বিন্দু শুক্রের উপর" পুরুষত্ব বা নারীত্ব বিষয়টি নির্ভর করে। যাই হোক মোটামুটিভাবে সাম্প্রতিক কালেও বিশ্বাস করা হতো যে, মাতৃকোষ হতেই শিশুর লিঙ্গ নির্ধারিত হয়। কোরআনে প্রদত্ত এই তথ্যটি বিংশ শতাব্দীর বিজ্ঞান উদঘাটন করেছে। মানুষের জন্ম সম্বন্ধে এটি এবং বহু তথ্যাদি শতাব্দী পূর্বে কোরআনে উল্লেখ করা হয়েছে। Y ক্রোমোজোম পুরুষালী বৈশিষ্ট্যসমূহ ধারণ করে থাকে আর X ক্রোমোজোমে নারীসুলভ বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান। মায়ের ডিম্বাণূতে থাকে শুধু X ক্রোমোজোম যা নারীর স্বভাব নির্ণয় করে। পিতার বীর্যে শুক্রাণুতে থাকে হয় X ক্রোমোজোম অথবা Y ক্রোমোজোম। সুতরাং বাচ্চার লিংগ নির্ভর করে- পিতার শুক্রাণুর X অথবা Y ক্রোমোজোম ডিম্বাণুকে নিষিক্ত করে কিনা তার উপর। অন্য কথায় আয়াতটিতে বলা হয়েছে ঠিক তেমনি বাচ্চার লিংগ নির্ধারণকারী উপাদান আসে পুরুষ থেকে নির্গত বীর্য থেকে। এই জ্ঞানটি কোরআন নাযিল হওয়ার সময়ে মানুষের জানা ছিল না যা কিনা প্রমাণ করে যে কোরআন আল্লাহরই কথা।*

এ ক্রোমোজোমদ্বয়ের যে কোন একটির ক্রস কম্বাইনেশনের মাধ্যমে নুতন এক মানব সন্তানের জন্মের সূত্রপাত ঘটে আর এ ক্রোমোজোমগুলো পুরুষ আর নারীতে জোড়ায় জোড়ায় অবস্থান করে। অভ্যুলেশনের সময় নারীর সেক্স কোষের দুটি (ডিম্বাশয় থেকে ডিম্বাণু বের হওয়ার সময়) অংশ দুটিভাগে বিভক্ত হয়, এদুটি অংশই X ক্রোমোজোম বহন করে থাকে। অন্যদিকে পুরুষের সেক্স কোষ দু ধরণের শুক্রকীট বা স্পার্ম তৈরী করে, এদের একটিতে থাকে X ক্রোমোজোম আর অন্যটিতে Y ক্রোমোজোম। যখন নারীর X ক্রোমোজোম পুরুষের Y ক্রোমোজোমের সঙ্গে মিলিত হয় তখন বাচ্চাটি হবে মেয়ে। আর যদি তা পুরুষের শুক্রাণুর Y ক্রেমোজোমের সঙ্গে মিলিত হয় তবে বাচ্চাটি হবে ছেলে।

অন্য কথায় পুরুষের যে ক্রোমোজোমটি নারীর ডিম্বাণুর ক্রোমোজোমের সঙ্গে মিলিত হয় সেটির উপরই নিভর্র করছে বাচ্চার সেক্স বা লিঙ্গ।

বিংশ শতাব্দীতে জেনেটিক্স আবিষ্কারের আগে পর্যন্ত এই তথ্যগুলো জানা সম্ভব ছিল না। বাস্তবে বহু সংস্কৃতিতেই বিশ্বাস ছিল যে, বাচ্চার লিঙ্গ নির্ধারিত হয় নারীর দেহ দ্বারা। আর সেজন্যেই কন্যা সন্তান জন্ম নিলে নারীকেই দোষী সাব্যস্ত করা হত।

মানুষের জীন আবিষ্কৃত হওয়ার আগে তেরোশত বছর পূর্বে কোরআন তথ্য দিয়েছিল যা অন্ধ বিশ্বাস প্রত্যাখ্যান করে এবং লিংগ নির্ণয়ে পুরুষের ভূমিকার কথা বলে।

## জরায়ুতে আটকে থাকা রক্তপিন্ড

মানব শিশুর জন্ম সম্পর্কে কোরআনে ঘোষিত তথ্যাদিসমূহ যদি আমরা পর্যবেক্ষণ করে যেতে থাকি তবে আমরা অতি গুরুত্বপূর্ণ বৈজ্ঞানিক অলৌকিক ঘটনাসমূহের সম্মুখীন হব।

পুরুষের শুক্রকীট যখন মহিলার ডিম্বাণুর সঙ্গে মিলিত হয় তখন জন্ম নেয়া শিশুর মৌলিক অংশ গঠিত হয়ে যায়। জীববিদ্যায় "জাইগোট" নামের একটি কোষ তৎক্ষণাৎ বিভাজনের মাধ্যমে পুণরুৎপাদন শুরু করে দেয় আর ফলে তা ভ্রুণ নামক একটি "মাংসল পিন্ডে" পরিণত হয়। অবশ্য এটি মানুষ কেবল মাইক্রোস্কোপের সাহায্যে দেখতে পারে।

যাই হোক এই ভ্রুণ পূর্ণতা লাভ করার সময় জরায়ুতে কেবলি শূণ্যে সময় কাটায় না। শেকড় যেমন এর আঁকশির মাধ্যমে মাটিতে শক্তভাবে গেঁথে থাকে, ভ্রুণও তেমনি জরায়ুর গায়ে শক্ত হয়ে লেগে থাকে। এ বন্ধনের মাধ্যমে ভ্রুণ তার বৃদ্ধির জন্য মায়ের দেহ থেকে প্রয়োজনীয় পুষ্টি পেয়ে থাকে।[১৬]

এ বিষয়ে কোরআনে একটি তাৎপর্যপূর্ণ অলৌকিক বিষয় প্রকাশিত আছে। মাতৃগর্ভে ভ্রুণের পূর্ণতা লাভের ব্যাপারটি উল্লেখ করতে গিয়ে আল্লাহ তাআলা "আলাক্ব" শব্দটি ব্যবহার করেছেন :

পাঠ করুন আপনার রবের নামে, যিনি সৃষ্টি করেছেন। যিনি সৃষ্টি করেছেন মানুষকে জমাট রক্ত (আলাক্ব) থেকে, পাঠ করুন, আর আপনার রব অতিশয় দয়ালু । (কোরআন, ৯৬ : ১৩)

*আরবী ভাষায় "আলাক্ব" শব্দের অর্থ এমন "একটি জিনিষ যা কোন জায়গায় আটকে থাকে।" আক্ষরিক অর্থে একটি জোঁকের বর্ণনা দেয়া যায় যা কোন দেহে লেগে থেকে তার রক্ত শোষণ করে।*

*জরায়ুতে প্রথম পূর্ণতা লাভের সময় বাচ্চা জাইগোট আকারে মায়ের জরায়ুতে লেগে থাকে যেন মায়ের রক্ত থেকে পুষ্টি পেতে পারে। উপরের চিত্রটি একটি জাইগোটের, যা দেখতে একটি মাংসপিন্ডের ন্যায়। আধুনিক ভ্রুণবিদ্যা এই গঠনটি আবিষ্কার করতে পেরেছে যা কিনা পবিত্র কোরআনে ১৪০০ বছর আগেই অলৌকিকভাবে "আলাক্ব" শব্দটি দ্বারা উল্লেখিত হয়েছিল যার*

*অর্থ “এমন একটি জিনিষ যা  কোন জায়গা আকড়ে পড়ে থাকে”  । আর এ শব্দটি দ্বারা জোঁকের বর্ণনা দেয়া হয়েছে যা রক্ত শোষণের জন্য দেহকে আটকে ধরে থাকে।*

নিশ্চিতভাবেই মাতৃগর্ভে ভ্রুণের বৃদ্ধির বেলায় এমন একটি সঠিক শব্দের ব্যবহার আরো একবার প্রমাণ করে যে,  কোরআন সারা জাহানের মালিক আল্লাহ কর্তৃক নাযিল হয়েছে।

## মাংস অস্থিকে জড়িয়ে আবৃত করে রাখে

কোরআনের আয়াতে প্রেরিত তথ্যাদির আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো মাতৃগহ্বরে মানব শিশুর বৃদ্ধির পর্যায়গুলোর বর্ণনা। সে আয়াতসমূহে উল্লেখ করা হয়েছে যে,  জরায়ুতে অস্থিসমূহ প্রথম তৈরী হয়ে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় আর তারপর মাংসপেশী সৃষ্ট হয়ে সেগুলোকে জড়িয়ে ঢেকে দেয়।
এরপর আমি শুক্রবিন্দুকে পরিণত করি এমন 'আলাক্বে'  যা লেগে থাকে,  এরপর সে আলাক্বকে পরিণত করি পিন্ডতে,  তারপর সেই পিন্ড থেকে সৃষ্টি করি অস্থি,  পরে অস্থিকে ঢেকে দেই- গোশ্ত দিয়ে,  তারপর তাকে গড়ে তুলি এক নূতন সৃষ্টিরূপে। সুতরাং কত মহান কল্যাণময় আল্লাহ যিনি সর্বোত্তম স্রষ্টা। (কোরআন,  ২৩ : ১৪)
বিজ্ঞানের একটি শাখা ভ্রুণবিজ্ঞান মাতৃগর্ভে ভ্রুণের বৃদ্ধি নিয়ে পর্যালোচনা করে । অতি সাম্প্রতিককালের ভ্রুণতত্ত্ববিদগণের ধারণা ছিল যে,  মাংস আর অস্থি ভ্রুণ থেকে একই সময়ে সৃষ্ট হয়ে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। এ কারণে দীর্ঘ সময় পর্যন্ত কিছু কিছু লোক দাবি করতে থাকে যে, বিজ্ঞানের সঙ্গে এ আয়াতগুলোর বিরোধ রয়েছে। নুতন প্রযুক্তির গুণে সৃষ্ট আধুনিক মাইক্রোস্কোপের সাহায্যে গবেষণা চালিয়ে উদঘাটিত হয়েছে যে কোরআনের কথাই অক্ষরে অক্ষরে সত্য।

*হাড্ডিসমূহ মাতৃগর্ভে উন্নীত হওয়া শেষ হলে পরে একটি নির্দিষ্ট পর্যায়ে মাংস পেশী দিয়ে আবরিত হয় বা ঢেকে যায়।*

আনুবিক্ষীনিক পর্যায়ে পরীক্ষা করে দেখা গেছে যে, কোরআনের আয়াতটিতে যেভাবে বর্ণনা করা আছে ঠিক সেভাবেই মাতৃগর্ভে মানব শিশুর বৃদ্ধি বা উন্নয়ন চলতে থাকে। প্রথমে ভ্রুণের উপাস্তি) Cartilage (টিস্যু অস্তিতে পরিণত হয়। এরপর অস্তিসমূহের চারদিকের নির্বাচিত টিস্যু অনুযায়ী মাংসের কোষসমূহ একত্রে এসে অস্তিসমূহকে আবৃত করে রাখে।

*কোরআনে শিশুর বৃদ্ধির বহু পর্যায়ের বর্ণনা রয়েছে। যেমন সূরা মুমিনুনের চৌদ্দ নং আয়াতে বর্ণিত আছে যে, জরায়ুতে প্রথম উপাস্তিগুলো অস্তিতে পরিণত হয়। এগুলো পরে মাংসপেশী দিয়ে আবৃত হয়। আয়াতে আল্লাহ তাআলা উন্নয়নের এই পর্যায়গুলোকে এভাবে বর্ণনা করেছেন, ". . . . . . পিন্ডকে পরে অস্তিতে পরিণত করি আর তারপর মাংসপেশী দ্বারা অস্তিকে জড়িয়ে দেই।"*

একটি বৈজ্ঞানিক পত্রিকায় Developing Human নামে টাইটেল দেয়া একটি পরিচ্ছদে এই ঘটনাটি এভাবে বর্ণনা করা হয়েছে :

সপ্তম সপ্তাহের দিকে অস্তিসমূহ পুরো দেহে ছড়িয়ে যায় আর তাদের পরিচিত আকৃতি ধারণ করে । সপ্তম সপ্তাহের শেষদিকে আর অষ্টম সপ্তাহে মাংসপেশীসমূহ অস্তিসমূহের চারদিকে অবস্থান গ্রহণ করে।[১৭]

সংক্ষেপে কোরআনে জরায়ুতে মানুষের বৃদ্ধিপ্রাপ্তির পর্যায়গুলোর যে বর্ণনা দেয়া হয়েছে তা আধুনিক ভ্রুণবিদ্যার প্রাপ্ত তথ্যসমূহের সঙ্গে সামঞ্জস্য বিধান করে।

## মাতৃগর্ভে বাচ্চার তিনটি পর্যায়

মানুষ যে মাতৃগর্ভে তিনটি ভিন্ন ভিন্ন পর্যায়ে সৃষ্ট হয়েছে- এটাই বর্ণিত হয়েছে পবিত্র কোরাআনে :

...তিনি তোমাদের সৃষ্টি করেছেন তোমাদের মাতৃগর্ভে এক অবস্থার পর অন্য অবস্থায় ত্রিবিধ অন্ধকারের মধ্যে। তিনিই আল্লাহ, তোমাদের রব, সর্বময় কর্তৃত্ব তাঁরই। তিনি ছাড়া কোন মাবুদ নেই। অতএব তোমরা কোথায় ফিরে যাচ্ছ? ( কোরআন, ৩৯ : ৬)

মানুষ যে মাতৃগর্ভে তিনটি ভিন্ন ভিন্ন পর্যায়ে সৃষ্ট হয়েছে তাই আয়াতটি নির্দেশ করে বলে বুঝা যাবে। সত্যিই বর্তমান জীববিদ্যা প্রকাশ করছে যে, মাতৃগর্ভে স্পষ্টভাবে ভিন্ন ভিন্ন তিনটি অঞ্চলে শিশুর ভ্রুণের বৃদ্ধি হয় । বর্তমানে চিকিৎসাবিদ্যার প্রতিটি শাখায় পঠিত সমস্ত ভ্রুণদ্যিার বইগুলোয় এ বিষয়টি মৌলিক জ্ঞানের একটি উপাদান হিসেবে নেয়া হয়। উদাহরণ স্বরূপ মূল ভ্রুণ বিদ্যার (ভ্রুণ বিদ্যার শাখায় এটি একটি মৌলিক রেফারেন্স) এ সত্যটি এভাবে তুলে ধরা হয়েছে : জরায়ুতে জীবনের তিনটি পর্যায় রয়েছে : প্রথম আড়াই সপ্তাহ- ভ্রুণ পুর্ববর্তী অবস্থা )Pre-embrynic(, আটসপ্তাহের শেষ পর্যন্ত ভ্রুণাবস্থা )Embyonic(, আর আট সপ্তাহ থেকে জন্ম পর্যন্ত অবস্থা )Fetal ।(

এই অবস্থাসমূহ শিশুর বৃদ্ধির সময় বিভিন্ন পর্যায়ের উল্লেখ করে থাকে। সংক্ষেপে এই পরিপক্ক হওয়ার সময়ের ভিন্ন ভিন্ন বৈশিষ্ট্যসমূহ নিম্নরূপ :

## ভ্রুণ পূর্ববর্তী পর্যায়

এ স্তরে জাইগোট বিভাজনের মাধ্যমে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়ে থাকে আর যখন এটি কোষগুচ্ছে (cellcluster) পরিণত হয়; এটি তখন নিজেকে নিজে জরায়ুর দেয়ালে আংশিক ঢুকিয়ে দেয়। যখন বর্ধিত হতে থাকে তখন কোষগুলো নিজেরা তিনটি স্তরে সজ্জিত হয়।

## ভ্রুণাবস্থা

দ্বিতীয় এই পর্যায়টি বিদ্যমান থাকে সাড়ে পাঁচ সপ্তাহ। এ সময় শিশুকে বলা হয় ভ্রুণ। এ সময় কোষস্তর থেকে দেহের মৌলিক অঙ্গাদি আর তন্ত্রসমূহ হাজির হয়।

### ভ্রুণ পরবর্তী অবস্থা

এ অবস্থা থেকে ভ্রুনকে বলা হয় ফিটাস । গর্ভাবস্থার অষ্টম সপ্তাহ থেকে এ অবস্থাটি শুরু হয় আর জন্মের মুহূর্ত পর্যন্ত এ অবস্থাটি বিদ্যমান থাকে। এ পর্যায়ে ভিন্ন একটি বৈশিষ্ট হলো যে মুখ, হাত আর পাসহ শিশুটি এ পর্যায়ে মানব শিশুর মতো দেখা যায়। যদিও প্রাথমিক পর্যায়ে এটি মাত্র তিন সেন্টিমিটার লম্বা, তথাপি সমস্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্গসমূহ পরিষ্কারভাবে দেখা যায়। এ অবস্থাটি ত্রিশ সপ্তাহ বজায় থাকে আর বাচ্চার বৃদ্ধি জন্ম পর্যন্ত অব্যাহত হতে থাকে।

*সূরা যুমারের ৬নং আয়াতে নির্দেশিত হয়েছে যে, মায়ের জরায়ুতে মানব শিশু সুস্পষ্ট তিনটি পর্যায়ে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। সত্যিই আধুনিক ভ্রুণবিদ্যায় এটি আবিষ্কৃত হয়েছে যে, জরায়ুতে শিশুর ভ্রুণের বৃদ্ধি তিনটি পৃথক পৃথক স্তরে ঘটে- থাকে।*

কেবলি আধুনিক যন্ত্রপাতি দিয়ে অবলোকনের পরই মায়ের জরায়ুতে মানব শিশুর বৃদ্ধিপাপ্তির খবরাখবর নেয়া সম্ভব হয়েছে। অথচ অন্যান্য বৈজ্ঞানিক সত্যসমূহের মতোই এ ব্যাপারটি কোরআনে- সংযোজিত হয়েছে অলৌকিকভাবে। যে সময়ে চিকিৎসাবিদ্যা সম্পর্কে মানুষের অল্পই জ্ঞান ছিল সে সময়ে কোরআনে খুঁটিনাটি আর সঠিক তথ্যাদি বর্ণনা করা হয়েছে- এটি কোরআন যে মানুষের নয়, বরং আল্লাহর বাণী এটিই পরিষ্কারভাবে প্রমাণিত হয়।

## মায়ের দুধ

মহান আল্লাহ তাআলা মায়ের দুধের মতো একটি অতুলনীয়, অসমকক্ষ মিশ্রণ তৈরী করেছেন, যা কিনা জন্ম পরবর্তী বাচ্চার একটি অপূর্ব খাদ্যউৎস্য, তার উপরে এটি বাচ্চার রোগপ্রতিরোধ ক্ষমতাও বাড়িয়ে দেয়। এমনকি আজকের টেকনলজীর মাধ্যমে কৃত্রিম ভাবে তৈরী বাচ্চাদের খাদ্যসমূহকে অলৌকিক এই মিশ্রণের উৎসটির (মায়ের দুধ) বিকল্প খাদ্য হিসেবে প্রতিস্থাপন করা যায় না।

*প্রতি দিনেই মায়ের দুধের গুণাগুণ একটি একটি করে আবিষ্কার করা হচ্ছে। মাতৃদুগ্ধ সম্পর্কে বিজ্ঞানে যা আবিষ্কার করা হচ্ছে তারই একটি হলো যেজন্মের পর দু বছর পর্যন্ত মায়ের দুধ - পানের বিশেষ উপকারিতা রয়েছে।[১৭] অতি সাম্প্রতিক কালে বিজ্ঞান কর্তৃক আবিষ্কৃত এই ব্যাপারটিই আল্লাহ তাআলা কোরআনে ১৪০০ বছর আগে এই আয়াতে আমাদের অবহিত করেছেনআর আমি ম- ানুষকে তার পিতামাতা সম্বন্ধে নির্দেশ দিয়েছি সদাচরণ তাদের সাথে) তার মাতা কষ্টের পর কষ্ট সহ্য করে তাকে গর্ভে ধারণ করেছে এবং দুবছরে তার দুগ্ধ ।(করতে ছাড়ানো হয়। সুতরাং শোকরগুজারী কর আমার এবং তোমার মাতা- পিতার। অবশেষে আমারই কাছে ফিরে আসতে হবে। কোরআন), ৩১ (১৪ :*

## আঙ্গুলের ছাপে মানুষের পরিচয়

যখন কোরআনে বলা হয় যে, মৃত্যুর পর মানুষকে পূর্বাবস্থায় ফিরিয়ে আনা আল্লাহ তাআলার জন্য অতি সহজ কাজ, তখন মানুষের আঙ্গুলের রেখাসমূহের (ছাপের) উপর বিশেষভাবে জোর দেয়া হয়েছে। মানুষ কি ধারণা করে যে, আমি তার হাড়সমূহ একত্র করতে পারব না ?
হ্যাঁ, অবশ্যই আমি একত্র করব। কেননা আমি তার অঙ্গুলির অগ্রভাগ পর্যন্ত যথাযথভাবে ঠিক করে দিতে সক্ষম। (কোরআন, ৭৫ : ৩৪)

*এমনকি হুবহু একই রূপ যমজ পর্যন্ত প্রত্যেকেরই রয়েছে অনন্য সাধারণ অঙ্গুলির রেখাসমূহ। অন্য কথায় মানুষের পরিচয় তাদের অঙ্গুলি সমূহে সংকলনভুক্ত অর্থাৎ সংকেত লিপির সাহায্যে লেখা রয়েছে। সংকলনের এই সিস্টেমটি অধুনা ব্যবহৃত বারকোড বা রেখাসঙ্কেত সিস্টেমের সঙ্গে তুলনা করা চলে।*

অঙ্গুলীর রেখা সমূহের উপর গুরুত্ব প্রদান করার ব্যাপারে একটি বিশেষ অর্থ রয়েছে। কারণ প্রত্যেকের অঙ্গুলীর রেখাসমূহ অনন্য, অদ্বিতীয়। প্রতিটি মানুষ, জীবিত কিংবা কোন কালে জীবিত ছিল, এরূপ প্রত্যেকেরই একসেট অনন্য রেখাঙ্গুলী রয়েছে।

আর তাই অঙ্গুলীর রেখাসমূহকে মানুষের পরিচয়ের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রমাণ হিসেবে একচেটিয়াভাবে গ্রহন করে নেয়া হয়েছে আর এ উদ্দেশ্যেই তা পৃথিবীর সর্বত্র ব্যবহার করা হয়।

গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এটি যে কেবল গত ঊনবিংশ শতাব্দিতে অঙ্গুলির ছাপের বৈশিষ্ট্যগুলো আবিষ্কৃত হয়েছে। এর আগে মানুষ এগুলোকে কোন গুরুত্বহীন সাধারণ বক্ররেখা হিসেবেই জানতো। কিন্তু কোরআনে এই অঙ্গুলী রেখাসমূহের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে যা সে সময়ে কারো মনোযোগ আকর্ষণ করতে পারেনি এবং আল্লাহ এই গুরুত্বটির প্রতি আমাদের মনোযোগ দেয়ার জন্য আহ্বান করেছেন যে গুরুত্বের কথা অবশেষে আমাদের কালে মানুষ বুঝতে পারছে।

# কোরআনে ভবিষ্যৎবাণী

## ভূমিকা

এমন কিছু গুরুত্বপূর্ণ ঘটনার কথা কোরআন আগেই প্রকাশ করে যেগুলো পরে ভবিষ্যতে সত্যি সত্যি ঘটেছিল- এটিও কোরআনের অলৌকিকত্বের একটি দিক। উদাহরণ স্বরূপ সূরা ফাতহ্ এর ২৭ নং আয়াতে আল্লাহ তাআলা মুসলমানদের এই সুসংবাদ দেন যে তখনকার দিনে পৌত্তলিকদের দখলকৃত মক্কা অচিরেই মুসলমানেরা জয় করে নেবে :

*নিশ্চয়ই আল্লাহ তাঁর রাসূলকে বাস্তবায়িত করে দেখিয়েছেন স্বপ্নটি যথাযথভাবে। অবশ্যই তোমরা আল্লাহর ইচ্ছায় মসজিদে হারামে প্রবেশ করবে নিরাপদে, তখন তোমাদের মধ্যে কেউ কেউ মাথা মুড়াতে থাকবে এবং কেউ কেউ চুল কাটতে থাকবে। তোমাদের কোন প্রকার ভয় থাকবে না । আল্লাহ জানেন যা তোমরা জান না। আর তিনি তোমাদেরকে এ স্বপ্ন বাস্তবায়িত হওয়ার পূর্বে এক আশু বিজয় দিলেন। কোরআন), ৪৮ (২৭ :*

আরো গভীরভাবে বিবেচনা করলে দেখা যায় যে, আয়াতটি কিন্তু মক্কা বিজয়ের পূর্বে আরেকটি বিজয়ের সংবাদ ঘোষণা করে। বাস্তবিকই মুসলমানরা আয়াতটির ঘোষণার মতোই মক্কা বিজয়ের পূর্বে প্রথমে ইহূদিদের দখলকৃত খাইবার দুর্গ দখল করে নেয় এবং তারপর মক্কায় প্রবেশ করে।

*যে ঘটনাগুলো ভবিষ্যতে ঘটবে, আগে ভাগেই এদের ঘোষণা করা কোরআনের প্রাজ্ঞতার এক টুকরা উদাহরণ মাত্র। কোরআনের কথা যে অসীম জ্ঞানবান আল্লাহরই বাণী এই সাক্ষ্যও দিচ্ছে এই ব্যাপারটি। বাইজেন্টাইনের পরাজয়ের কথা ভবিষ্যতে ঘটে যাওয়া অন্যান্য ঘটনার মতো একটি যা কোরআনে ঘোষণা করা হয়েছিল যেগুলো সে সময়কার মানুষের পক্ষে কোন ভাবেই জানা সম্ভব ছিল না। এই ঘটনার সবচাইতে কৌতুহলের ব্যাপারটি এই যে রোমানরা পৃথিবীর সবচাইতে নিম্নতম অঞ্চলে পরাজয় বরণ করে ছিলপরবর্তী- তে ব্যাপারটি বিস্তারিত বর্ণনা করা হবে। এটি মজার যে এখানে "সর্বনিম্ন পয়েন্টের" কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। সে আমলের প্রযুক্তি দিয়ে এমন একটি মাপযোখ করে পৃথিবীর নিম্নতম অঞ্চল নির্ধারণ একেবারে*

*স্পষ্টভাবেই অসম্ভব ব্যাপার ছিল। এসবই মানব জাতির উদ্দেশ্যে মহাজ্ঞানী আল্লাহ সোবহানাল্লাহু তাআলার প্রকাশিত বাণী।*

## বাইজেন্টাইনদের বিজয়

কোরআন নাযিলের আরেকটি আশ্চর্য ঘটনা এই যে সূরা রূমের প্রথম আয়াতে বাইজেন্টাইন সম্পর্কে ভবিষ্যৎ বাণী করা হয়েছে। পরবর্তী রোমান সাম্রাজ্যের পূর্বদিকের একটি অংশই হলো বাইজেন্টাইন। উক্ত আয়াতগুলোতে উল্লেখ করা হয় যে, বাইজেন্টাইন সাম্রাজ্য একটি পরাজয়ের মুখোমুখি হয়েছিল ঠিকই কিন্তু শীঘ্রই জয়ের মুখ দেখবে।

আলিফ লাম মীম

রোমকরা পরাজিত হয়েছে,

এক নিম্নতম স্থানে এবং তারা তাদের এ পরাজয়ের পর অতি সত্বর জয়লাভ করবে, তিন থেকে নয় বছরের মধ্যে। পূর্বের ও পরের ফয়সালা আল্লাহরই। আর সেদিন মুমিনরা আনন্দিত হবে। (কোরআন, ৩০ : ১- ৪)

*মৃতসাগরের তলানি যেখানে বাইজেন্টিনরা পারস্যদের হাতে পরাজয় বরণ করে। উপরে এলাকাটির একটি উপগ্রহ চিত্র দেখা যাচ্ছে। লূত হ্রদের এলাকা, পৃথিবীর সবচাইতে নিম্নতম এই এলাকাটি সমুদ্র পৃষ্ঠের ৩৯৫ মিটার নিম্নে অবস্থিত।*

*পৌত্তলিক পারস্যদের হাতে বাইজেন্টাইন খৃষ্টানদের গুরুতর পরাজয় বরণ করার ৭ বছর পরে, ৬২০ সনে উক্ত আয়াতগুলো নাযিল হয়েছিল। বাইজেন্টাইনরা খুব অল্প সময়ের মাঝেই বিজয় ছিনিয়ে নেবে আয়াতগুলোতে তাই বর্ণিত হয়েছিল। সত্যি বলতে কি, বাইজেন্টাইনরা কেবল মারাত্মক পরাজয়ই বরণ করেনি, এমনকি এটির টিকে থাকাই যেখানে অসম্ভব হয়ে দাড়িয়েছিল সেখানে জিতার কথা বাদই দিতে হয়। কেবল পারস্যরাই নয়, মারাত্মক ভীতির কারণ হিসেবে*

*আরও বিদ্যমান ছিল আভারস, স্লাভ, আর লম্বার্ডরা। আভারস্ কন্সটান্টিনোপোলের দেয়াল পর্যন্ত এসে গিয়েছিল। বাইজেন্টাইন সম্রাট হেরাক্লিয়াস গির্জাসমূহের স্বর্ণ, রৌপ্যগুলো গলিয়ে মুদ্রা বানিয়ে তার বাহিনীদের খরচ মেটানোর আদেশ দিলেন। এগুলোও যখন অপর্যাপ্ত মনে হলো তখন এমনকি ব্রোঞ্জের মূর্তিগুলো গলিয়ে মূদ্রা বানানো হলো। বহু গভর্ণর হেরাক্লিয়াসের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেছিল আর তার সাম্রাজ্য ছিল পতনের মুখে। আগের বাইজেন্টাইনের অধীনস্ত রাষ্ট্র, যেমন, মেসোপটেমিয়া, সিলিসিয়া, সিরিয়া, পেলেস্টাইন, মিসর, আর্মেনিয়া তখন মূর্তিপূজক পারস্যদের অধীনস্ত হয়ে গিয়েছিল।*[২০]

স্বল্প কথায় সকলেই মনে করছিল যে বাইজেন্টাইন সাম্রাজ্য ধ্বংস হয়ে যাবে। ঠিক সেই মুহূর্তে সূরা রূমের প্রথম কয়েকটি আয়াত নাযিল হয়, যাতে ঘোষিত হয়েছিল যে, কয়েক বছরের মাথায় বাইজেন্টাইনরা বিজয় ছিনিয়ে নেবে। কিন্তু বিজয় তখন এমনি অসম্ভব ছিল যে, বহু-ঈশ্বরবাদী আরবরা আয়াত কয়টি নিয়ে পরিহাস শুরু করে দিল। তারা ভেবেছিল যে কোরআনের এই বিজয়ের ঘটনা কখনও সত্যি হবে না।

সূরা রূমের প্রথম আয়াতখানা নাযিলের সাত বছর পরে ৬২৭ সনের ডিসেম্বরে বাইজেন্টাইন আর পারস্যদের মাঝে একটি চূড়ান্ত যুদ্ধ শুরু হল নিনেভেহতে। এই সময় আশাতীতভাবে বাইজেন্টাইনরা পারস্যদের পরাজিত করল। কয়েক মাস পরে পারস্যরা বাইজেন্টাইনদের সঙ্গে চুক্তি করতে বাধ্য হল, যারই ফলে তাদেরকে নিজেদের দখল করা অংশগুলো হতে হটতে বাধ্য হয়েছিল।[২১]

অবশেষে আল্লাহ তাআলার ঘোষণাকৃত "রোমকদের বিজয়" বাণীটি অলৌকিকভাবে সত্য হয়ে গিয়েছিল।

উক্ত আয়াতটির আরেকটি অলৌকিক বিষয় হলো ভৌগলিক বিষয় সম্বন্ধে একটি ঘোষণা যা তখনকার মানুষের পক্ষে জানতে পারা সম্ভব ছিল না।

*সূরা রূমের তৃতীয় আয়াতে আমরা আরো অবগত হই যে, রোমানরা পৃথিবীর সবচেয়ে নিম্ন এলাকায় পরাজিত হয়েছে। "আদনা আল আরব" এই অভিব্যক্তিটি বহু অনুবাদে "পাশ্ববর্তী স্থান"*

*হিসেবে অনূদিত হয়েছে। কিন্তু এটি মূল বক্তব্যের আক্ষরিক অর্থ না হয়ে বরং আলঙ্করিক অর্থ প্রকাশ করেছে। আরবীতে "আদনা" শব্দটি উৎপত্তি হয়েছে "দেনি" শব্দ থেকে যার মানে হলো "নীচু", আর "আরদ্" শব্দের অর্থ পৃথিবী। তাই "আদনা আল আরদ্" এর প্রকাশ ভঙ্গীটির অর্থ হলো "পৃথিবীর নিম্নতম এলাকা"।*

সবচেয়ে কৌতূহলের বিষয় হলো বাইজেন্টাইন আর পারস্যের যে যুদ্ধে বাইজেন্টাইনদের পরাজয় হয় আর ফলে তারা জেরুজালেমের উপর অধিকার হারিয়ে ফেলে সেই যুদ্ধেরই একটি অতি সংকটপূর্ণ পর্যায় সত্যি ঘটেছিল পৃথিবীর একটি নিম্নতম এলাকায়। বিশেষ এই এলাকাটি হলো মৃত সাগরের বেসিন বা গহ্বরে যা কিনা সিরিয়া, পেলেস্টাইন আর জর্দানের ভূভাগের ছেদন বিন্দুতে বিদ্যমান। সমুদ্র পৃষ্ঠের ৩৯৫ মিটার নিম্নের এই মৃত সাগরটি আসলেই ভূ-পৃষ্ঠের সর্বনিম্নাঞ্চল।

তার মানে হলো যে কোরআনে যেমন উল্লেখ রয়েছে ঠিক তেমনভাবেই বাইজেন্টাইনরা বিশ্বের সর্বনিম্ন এলাকায় হেরে গিয়েছিল।

মজার ব্যাপারটি হলো এই যে, কেবল মাত্র আধুনিককালের পরিমাপক প্রযুক্তি দিয়েই মৃত সাগরের গভীরতা মাপা যেতে পারে। এর আগে পৃথিবীপৃষ্ঠের সর্বনিম্ন এলাকাটি কোথায় বা কোনটি তা জানা সম্ভব ছিল না। কিন্তু কোরআনে উল্লেখ হয়েছে যে এটি পৃথিবীর সর্বনিম্ন এলাকা। এ ব্যাপারটি আবারো সাক্ষ্য দিচ্ছে যে কোরআন একটি স্বর্গীয় ধর্মগ্রন্থ।

# কোরআনের ঐতিহাসিক অলৌকিকতা

**কোরআনে “হামান” শব্দ**

প্রাচীন মিসর সম্পর্কে কোরআনের কিছু তথ্য বহু ঐতিহাসিক বিষয় উন্মোচিত করে যেগুলো কিনা সাম্প্রতিক কাল পর্যন্ত অনুদঘাটিত ছিল। এই বিষয়গুলো আমাদের আরো নির্দেশ করছে যে এ কোরআন এক নিশ্চিৎ মহাবিজ্ঞের পক্ষ থেকে নাযিল হয়েছে।

কোরআনে ফেরাউনের পাশাপাশি হামান নামক একটি চরিত্রের উল্লেখ রয়েছে। ফেরাউনের একজন কাছের মানুষ হিসেবে এ নামটি কোরআন শরীফের ছয়টি ভিন্ন অংশে উল্লেখ করা হয়েছে।

আশ্চর্যের বিষয় যে, তৌরাতের যে অংশে মূসার জীবনী রয়েছে, তাতে এ নামটি কখনো উল্লেখ করা হয়নি। তবে ওল্ড টেষ্টামেন্টের সর্বশেষ অধ্যায়ে ব্যাবিলনের এক রাজার সাহায্যকারী হিসেবে এ নামটি পাওয়া যায়, যে রাজা কিনা মূসার সময়ের ১১০০ বছর পরে ইসরাঈলীদের উপর নিষ্ঠুর অত্যাচার চালিয়েছিল।

কিছু অমুসলিম, যারা দাবী করে যে, রাসুলুল্লাহ (দঃ) তৌরাত এবং বাইবেল থেকে নকল করে কোরআন শরীফ সাজিয়েছেন, তারা জোর গলায় বলে যে, এ প্রক্রিয়ার সময় নবী (দঃ) কিছু কিছু বিষয়ে ত্রুটি সহকারে কোরআনে এনেছেন।

কিন্তু ২০০ বছর আগে যখন মিসরীয় প্রাচীন সংকেত লিপি হাইআরোগ্লিফিক (hieroglyphic) উদঘাটন করে বুঝা গেল আর প্রাচীন লিপিগুলোয় হামান শব্দটির উল্লেখ রয়েছে জানা গেল- তখন এই দাবির অসারতা প্রমাণিত হলো।

এই আবিস্কারের আগে প্রাচীন মিসরীয় লিখা আর অভিলিখন (শিলার গায়ে লিখা) বুঝা যেতো না। হাইআরোগ্লিফিক বা সংকেত লিখনে লিখা প্রাচীন মিসরীয় ভাষা যুগ যুগ টিকে ছিল। তবে, দ্বিতীয় এবং তৃতীয় শতাব্দিতে খৃষ্টান ধর্ম প্রচার আর অন্যান্য সংস্কৃতির প্রসারের ফলে মিসরীয়রা প্রাচীন বিশ্বাস আর হাইআরোগ্লিফিক বা সংকেত লিপি ভুলে যায়। সংকেত লিখনের সর্বশেষ জানা উদাহরণটি ৩৯৪ সনের একটি অভিলিখন ছিল। এরপর এ ভাষাটি স্মৃতি থেকে মুছে গিয়েছিল,

আর কেউ তা লিখতে বা বুঝতে পারতো না। ২০০ বছর আগে পর্যন্ত এ অবস্থাটি বিদ্যমান ছিল ...।

*১৭৯৯ সনে “Rosetta Stone” নামের একটি ট্যাবলেট বা লিপিফলক আবিষ্কারের ফলে প্রাচীন মিসরীয় সংকেতলিপি বা হাইআরোগ্লিফিক এর রহস্যের সন্ধান পাওয়া গেল; ফলকটি ছিল খ্রীষ্টের জন্মের ১৯৬ বছর আগের। এই অভিলিখন খানির গুরুত্ব এমনি ছিল যে, এটি তিনটি ভিন্ন ভিন্ন উপায়ে লিখা ছিল; উপায়গুলো ছিল হাইআরোগ্লিফিক, ডেমোটিক প্রাচীন মিসরীয় ) আর গ্রীক । গ্রীক লিখনটির সাহায্য নিয়ে প্রাচীন মিসরীয় (হাইআরেটিক লিখনের সহজরূপ সংকেত লিখনগুলোর অর্থ বের করা হলো ।*

Jean-Francoise Chamollion নামের একজন ফরাসী লোকের সহায়তায় লিপিখানির অনুবাদ সম্পূর্ণ করা হয়েছিল। এভাবে এই ভুলে যাওয়া ভাষা এবং এর সঙ্গে জড়িত কিছু ঘটনার প্রকাশ ঘটল। এমন করে প্রাচীন মিসরের সভ্যতা, ধর্ম আর সমাজ জীবনের বিশাল এক জ্ঞানের খোঁজ পাওয়া গেল।

*ঊনবিংশ শতাব্দীতে মিসরের ভাষা হাইআরোগ্লিফিক অনুবাদ করে উদঘাটন করার আগে পর্যন্ত “হামান” নামটি- জানা ছিল না। হাইআরোগ্লিফিক অনুবাদ করে বুঝা গেল যে হামান ফেরাউনের একজন নিকট সহযোগী ছিল এবং সে ছিল পাথর চূর্ণকারীদের প্রধান। উপরে প্রাচীন মিসরীয় ) (নির্মাণ শ্রমিকদের দেখা যাচ্ছেএখানে সত্যিকারের গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্টটি হলো যে কোরআনে হামান ফেরাউনের আদেশে নির্মাণকার্য পরিচালনা করতো বলে উল্লেখ করা হয়েছে। এর মানে এটিই দাঁড়ায় যে এই যে তথ্যটি যা সম্পর্কে কারো পক্ষে কিছু জানা সম্ভব ছিল না, তাই কোরআনে উল্লেখ করা হয়েছিল।*

*হাইআরোগ্লিফিক এর সংকেতগুলোর গূঢ়ার্থ বুঝতোরায় গুরুত্বপূর্ণ জ্ঞানের সন্ধান পাওয়া গেল :*
*বাস্তবিকই"হামান" শব্দটি মিসরীয় সংকেতলিপিতে লিখা ছিল। ভিয়েনার* Hof Museum *এ নামটির উল্লেখ রয়েছে।*[২২]

সমগ্র অভিলিখনগুলোর সংগ্রহের উপর নির্ভর করে তৈরী অভিধান People in the New Kingdom এ হামানকে "পাথর চূর্ণকারীদের নেতা" হিসেবে পরিচয় দেয়া হয়েছে।[২৩]

শিলালিপিটি একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সত্যের উন্মোচন করে দিল। কোরআন বিরোধীদের মিথ্যা দাবীর বিপরীতে দেখা গেল এই সেই ব্যক্তি হামান, যে কিনা মূসার (আঃ) সময়কালে ফেরাউনের একজন অতি কাছের মানুষ হিসেবে মিসরে বসবাস করে আসছিল। কোরআনে যেমন বলা হয়েছে ঠিক তেমনি, হামান নির্মাণ কাজে নিয়োজিত ছিল।

অধিকন্তু কোরআনের একটি আয়াতে একটি ঘটনায় যেমন উল্লেখ আছে যে ফেরাউন হামানকে একটি টাওয়ার নির্মাণের কথা বলছে, সেটি প্রত্নতত্ত্ববিদদের প্রাপ্ত তথ্যাবলীগুলোর সঙ্গে একদম মিলে যায় :

ফেরাউন বলল : হে সভাসদবৃন্দ ! আমি ছাড়া তোমাদের অন্য কোন উপাস্য আছে বলে আমি মনে করি না। হে হামান! তুমি আমার জন্য ইট পোড়াও, তারপর আমার জন্য একটি সুউচ্চ প্রাসাদ নির্মাণ কর, যাতে আমি মূসার মা'বুদের প্রতি উঁকি মেরে দেখতে পারি। তবে আমারতো ধারণা যে, সে অবশ্যই মিথ্যাবাদী। (কোরআন, ২৮ : ৩৮)

পরিশেষে, হামানের অস্তিত্বের বিষয়টি কোরআন বিরোধীদের বানোয়াট জাল দাবিকেই শুধু গুরুত্বহীন বলে প্রমাণ করেনি, বরং আবারো একবার প্রমাণ করে দিল যে, কোরআন এসেছে সর্বশক্তিমান আল্লাহর তরফ থেকে। একরকম অলৌকিকভাবেই কোরআন সেই সমস্ত ঐতিহাসিক ঘটনাসমূহ সম্পর্কে আমাদের জানিয়েছে যা নবীর সময়ে ঘটেনি কিংবা জানা ছিল না। (দঃ)

## কোরআনে মিসরের শাসকগণের উপাধি

মিসরের প্রাচীন ইতিহাস ঘেঁটে এ তথ্যই বেরিয়ে আসে যে, সে অঞ্চলে মুসা (আঃ) ই একমাত্র নবী হয়ে আসেননি। মুসার (আঃ) সময়ের বহু আগে ইউসুফ (আঃ) মিসরে বসবাস করে গেছেন। মুসা (আঃ) এবং ইউসুফ (আঃ) এ দুজনের ঘটনাবলী পড়তে গিয়ে আমরা কিছু সাদৃশ্যের বা তুলনার মুখোমুখি হই। কোরআনে ইউসুফ (আঃ) এর সময়কার মিসরের শাসকদের সম্বোধন করতে গিয়ে মালিক শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে।

মালিক (বাদশাহ) বলল : ইউসুফকে আমার কাছে নিয়ে এসো, আমি তাকে আমার একান্ত সহচর করে রাখব । তারপর সে যখন তার সাথে কথা বলল তখন সে বলল : নিশ্চয়ই আজ আপনি আমাদের কাছে অতিশয় মর্যাদাবান ও বিশ্বস্ত ( কোরআন, ১২ : ৫৪)

কিন্তু মুসার সময়ে শাসকদের ডাকা হতো (আঃ)"ফেরাউন" ।

আর আমি তো মূসাকে নয়টি প্রকাশ্য মু'জিযা দিয়েছিলাম, আপনি বনী ইসরাঈলকে জিজ্ঞেস করুন; যখন সে তাদের কাছে এসেছিল তখন ফেরআউন তাকে বলেছিল :"হে মূসা ! আমি তো মনে করি, অবশ্যই তুমি যাদুগ্রস্থ। ( কোরআন, ১৭ : ১০১)

আজ যে সমস্ত ঐতিহাসিক রেকর্ড পাওয়া যাচ্ছে তাতে শাসকগণের ভিন্ন ভিন্ন নামকরণের কারণ খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে। পূর্বে প্রাচীন মিসরে রাজপ্রাসাদকে "ফেরাউন" বলা হতো আর এখান থেকেই এসেছে এই শব্দটি। প্রাচীন রাজবংশের শাসকগণ তাদের উপাধি হিসেবে এই নামটি ব্যবহার করেননি। মিসরের ইতিহাসে "নূতন রাজ্য" যুগের পূর্ব পর্যন্ত রাজাদের উপাধি হিসেবে এ নামটি শুরু হয়নি। এই সময়কালটি ১৮তম রাজবংশের সঙ্গে শুরু হয় আর বিংশতম রাজবংশ থেকে রাজাদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করতে গিয়ে এই "ফেরাউন" শব্দটি টাইটেল হিসেবে ব্যবহৃত হতে শুরু করে।

এখানে আরেকবার কোরআনের অলৌকিকত্ব প্রমাণের আরেকটি উদাহরণ পাওয়া যায় : ইউসুফ (আঃ) প্রাচীন রাজত্বে বর্তমান ছিলেন যে যুগে রাজাদের "ফেরাউন" নয় বরং "মালিক" বলে

সম্বোধন করা হতো। উল্টো যেহেতু মুসা নূতন রাজ্যের যুগে বর্তমান ছিলেন (আঃ), তাই তখনকার শাসকদের "ফেরাউন" নামে ডাকা হতো।

সন্দেহ নেই যে এমন পৃথক করে বলার জন্য একজনকে মিসরের ইতিহাস জানতে হবে। কিন্তু চতুর্থ শতকের মাঝেই মিসরের ইতিহাস সম্পূর্ণরূপে ভুলে যায় মানুষ; কারণ মানুষ আর মিসরের ভাষা (হাইআরোগ্লিফিক) বুঝতে পারেনি; দীর্ঘদিন পর মিসরের ইতিহাস পুণরায় উনিশ শতকে উদ্ধার করা হয়। সুতরাং কোরআন নাযিল হওয়ার সময় মিসরের ইতিহাস সম্পর্কে কোন পুংখানুপুংখ জ্ঞান অর্জন করা সম্ভব ছিল না। অগণিত সাক্ষ্যপ্রমাণের মাঝে এটিও প্রমাণ করে যে কোরআন আল্লাহর বাণী।

# উপসংহার

## কোরআন আল্লাহরই বাণী

এই অবধি আমরা যা দেখেছি, তাতে একটি সত্যই স্পষ্টভাবে বেরিয়ে আসে কোরআন সেই : গ্রন্থ যাতে বর্ণিত প্রতিটি তথ্যই সত্য বলে প্রমাণিত হয়েছে। বিজ্ঞান বিষয়ক তথ্যাবলী আর কোরআনের উল ভবিষ্যতে ঘটবে এমন কটি বিষয় সম্পর্কে্লেখযার মানে- , যে সময়ে যা কিছু মানুষের পক্ষে জানা সম্ভব ছিল নাসেসবই কোরআনের আয়াতগুলোয় সেই সময়ে ঘোষিত - হয়েছিল। সেই সময়ের জ্ঞান আর টেকনোলজির মাত্রা বা অবস্থা দিয়ে এসব তথ্যসমূহ জানতে পারা ছিল অসম্ভব। এটাই স্পষ্ট সাক্ষ্য দান করছে যে কোরআন কোন মানুষের কথাবলী নয়। যিনি সব কিছু সৃষ্টি করেছেন আর যিনি তাঁর জ্ঞানের মাধ্যমে সব কিছু পরিবেষ্টন করে আছেন সেই মহাশক্তিশালী আল্লাহরই কথামালা এই কোরআন।

কোরআনের একটি আয়াতে আল্লাহ উল্লেখ করেছেন যে, "কোরআন যদি আল্লাহ ভিন্ন অন্য কারো তরফ থেকে আসতো, তবে তাতে তারা অসংখ্য অসামঞ্জস্য খুঁজে পেত।" ( কোরআন, ৪ কোরআনে অসামঞ্জস্য তো নয়ই (৮২ :, বরং এ স্বর্গীয় বইটির প্রতিটি তথ্য দিনে দিনে উত্তোরোত্তর অলৌকিকত্ব প্রকাশ করছে।

এখন মানুষের কর্তব্য আল্লাহর নাযিল করা এই বইখানি দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরে তার অনুসরণ করা আর এটিকেই এক মাত্র গাইড বা পরিচালিকা হিসেবে গ্রহন করে নেয়া। আল্লাহ আমাদের আহ্বান করে বলেছেন :

এটি একটি কিতাব, যা আমি নাযিল করেছি, অতীব বরকতময়। অতএব এর অনুসরণ কর এবং সতর্ক হও, যাতে তোমরা রহমতপ্রাপ্ত হও। (কোরআন, ৬ : ১৫৫)

অন্য একটি আয়াতে আল্লাহ উল্লেখ করছেন :

বলুন থেকে এসেছে সত্য তোমাদের রবের তরফ :; অতএব যার ইচ্ছা হয় ঈমান আনুক এবং যার ইচ্ছা হয় কুফরী করক। (কোরআন, ১৮ : ২৯)

না কখনও এরূপ করবেন না, এ কোরআন তো উপদেশবাণী। অতএব যার ইচ্ছা হয়, সে তা গ্রহন করুক। কোরআন), ৮০ ১১ :- ১২(

## বিবর্তনের ভ্রান্ত ধারণা

### ভূমিকা

আল্লাহর গ্রন্থ কোরআন যা কিনা আমাদের পথপরিচালিকা ও সাবধান বাণী হিসেবে প্রেরণ করা হয়েছে, সেটিরই কিছু অলৌকিক দিক আমরা আলোচনা করেছি। এই সমস্ত অলৌকিক বিষয়গুলো দিয়ে আল্লাহ আমাদের নিদর্শন প্রেরণ করেছেন যে এটি সত্যের গ্রন্থ এবং তিনি মানুষকে আহ্বান জানিয়েছেন যেন তারা এই বইটির ব্যাপারে বিবেচনা করে বা ভেবে দেখে। ভূ-পৃষ্ঠে সৃষ্টির নিখুত ডিজাইন সম্বন্ধে মানুষ স্বীকৃতি দান করবে আর এগুলো স্মরণের মাধ্যমে তাঁর শক্তির গুণগান করবে- এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি কোরআনে নির্দেশ করেছেন আল্লাহ তাআলা। কিন্তু আজ এমন কিছু ভাবাদর্শ বিদ্যমান যেগুলো মানুষের মন থেকে সৃষ্টির সত্যের বিষয়টিকে ভুলিয়ে দিতে চায় এবং ভিত্তিহীন কিছূ ধারণা দ্বারা এ বিষয়টিকে দূরে ঠেলে দিতে চায়।

এগুলোর মাঝে সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ বিষয় হলো বস্তুবাদ। বস্তুবাদ যেটিকে নিজের জন্য তথাকথিত বৈজ্ঞানিক ভিত্তি হিসেবে ধরে নেয় সেটিই হল ডারউইনবাদ। প্রাণ অজৈব বস্তু থেকে

যুগপৎ সংঘটনের মাধ্যমে উন্মেষিত হয়েছে বলে যুক্তি প্রদানকারী এই থিওরিটি নস্যাৎ হয়ে গিয়েছে তখনই, যখন স্বীকার করে নেয়া হয়েছে যে একমাত্র আল্লাহ তা'আলাই এই বিশ্বচরাচর সৃষ্টি করেছেন।

তিনি আল্লাহ যিনি মহাবিশ্ব সৃষ্টি করেছেন আর ক্ষুদ্রতম ও পুংখানুপুংখ ডিজাইন তৈরী করেছেন। বিবর্তনের যে থিওরীটি পোষণ করে যে জীব জগৎ আল্লাহর সৃষ্টি নয় বরং যুগপৎ সংঘটনের ফলাফল সেই থিওরীটি সত্য হতেই পারে না।

আশ্চর্য নয় যে, যখন আমরা বিবর্তন মতবাদটির দিকে দৃষ্টিপাত করি, তখন দেখতে পাই যে এটা বৈজ্ঞানিক তথ্যগুলো দ্বারাই বাতিল হয়ে যায়। প্রতিটি জীবের ডিজাইন অত্যন্ত জটিল আর চিত্তাকর্ষক। উদাহরণস্বরূপ, জড় জগতে অনুসন্ধান করে আমরা দেখতে পাই যে কি এক সূক্ষ্ম ভারসাম্যের উপর পরমাণুগুলো অবস্থান করে আছে এবং জীব জগতে আমরা লক্ষ্য করি যে, কেমন জটিল ডিজাইনের মাধ্যমে পরমাণুগুলো একত্রিত হয় আর কেমন অসাধারণ সেই পদ্ধতিসমূহ; আর আমিষ, এনজাইম আর কোষসমূহের গঠন যেগুলো এই পদ্ধতিগুলোর মাধ্যমেই উৎপন্ন হয়ে থাকে।

বিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে জীবে বিদ্যমান এই বিস্ময়কর ডিজাইন ডারউইনবাদকে অসিদ্ধ প্রমাণ করেছে।

আমরা এই বিষয়টি নিয়ে আমাদের অন্যান্য গবেষণাগুলোয় সবিস্তরে আলোচনা করেছি এবং এভাবেই তা করে যাওয়া অব্যাহত রাখব। অবশ্য আমাদের ধারণা, বিষয়টির গুরুত্ব বিবেচনায় এনে এখানেও এর উপর একটি ছোট সারাংশ তৈরী করলে তা কাজে আসবে।

## বৈজ্ঞানিকভাবে ডারউইনবাদের পতন

প্রাচীন গ্রীস থেকেই একটি মতবাদ হিসেবে চলে আসলেও বিবর্তন থিওরিটি ঊনবিংশ শতাব্দীতে ব্যাপকভাবে প্রসার লাভ করে। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উন্নয়ন ঘটে যখন "প্রজাতির উৎস" নামক বইখানা প্রকাশিত হয়ে থিওরিটিকে বিজ্ঞান জগতে সর্বশেষ টপিকে নিয়ে আসে। আল্লাহ তায়ালা বিভিন্ন প্রাণী প্রজাতিকে পৃথক পৃথকভাবে সৃষ্টি করেছেন- এটি ডারউইন তার এ বইখানায় অস্বীকার করেন । ডারউইনের মতানুসারে সমস্ত জীবেরই একটি সাধারণ পূর্বপুরুষ ছিল এবং এরা কালের যাত্রায় ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র পরিবর্তনের মাধ্যমে বিচিত্র রূপে আত্মপ্রকাশ করেছে ।

ডারউইনের থিওরিটি কোন দৃঢ় বৈজ্ঞানিক তথ্যের উপর ভিত্তি করে প্রতিষ্ঠিত ছিল না; তিনি নিজেও মেনে নিয়েছেন যে এটা ছিল নিছকই এক "অনুমান"। অধিকন্তু, ডারউইন তার "থিওরীর প্রতিকূলতা " নামক বইখানার দীর্ঘ অধ্যায়সমূহে স্বীকার করেছেন যে, থিওরিটি বহু সমালোচনামূলক প্রশ্নের উত্তর প্রদানে ব্যর্থ হচ্ছিল ।

ডারউইন নব নব বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের পানে তার সমস্ত আশা নিয়োগ করলেন, যেগুলো তার থিওরির প্রতিকূলতাগুলোর সমাধান নিয়ে আসবে বলে তার প্রত্যাশা ছিল । কিন্তু তার আশার বিপরীতে বৈজ্ঞানিত তথ্যগুলো এই সমস্যাগুলোর পরিধি আরো বাড়িয়ে দিল।

বিজ্ঞানের মোকাবেলায় ডারউইনবাদের এই পরাজয়টিকে তিনটি মূল আলোচ্য বিষয়ে পূণর্নিরীক্ষণ করা যায় :

১) ভূ- পৃষ্ঠে প্রাণের উন্মেষ কিভাবে হল- এর ব্যাখ্যা মতবাদটি কোনভাবেই প্রদান করতে পারে না।

*২থিওরিটি কর্তৃক প্র (স্তাবিত "বিবর্তন প্রক্রিয়াগুলোর" বিবর্তন ঘটানোর কোন প্রকার ক্ষমতা আদৌ আছে কি নেই তা প্রমাণ করার জন্য কোন বৈজ্ঞানিক তথ্য নেই ।-*

৩) জীবাশ্ম রেকর্ডসমূহ বিবর্তন থিওরির প্রস্তাবনাসমূহের সম্পূর্ণ উল্টো তথ্য বা প্রমাণ সরবরাহ করে ।

এই পরিচ্ছেদে আমরা এই তিনটি মূল বিষয় সাধারণ পরিধিতে পর্যবেক্ষণ করব :

## অনতিক্রম্য প্রথম ধাপ : প্রাণের উন্মেষ

বিবর্তন মতবাদ শুধুমাত্র তর্কের খাতিরে এটাই শুদ্ধ বলে ধরে নেয় যে, ৩৮.বিলিয়ন বছর আগে আদি পৃথিবীতে আবির্ভূত একটি মাত্র জীবকোষ হতেই সমস্ত জীবিত প্রজাতির বিকাশ ঘটেছে । কিভাবে একটি মাত্র কোষ হতে মিলিয়ন মিলিয়ন জটিল প্রজাতির উদ্ভব হলো, আর বিবর্তন বলে যদি কিছু ঘটেই থাকে তবে ফসিল রেকর্ডে কেনইবা এর সামান্য কোন নিদর্শন পাওয়া যায় না এ- ধরণের কোন প্রশ্নের উত্তর প্রদানে মতবাদটি অক্ষম। যাইহোক, সর্বাগ্রে, উক্ত বিবর্তন প্রক্রিয়ার প্রথম ধাপটি অনুসন্ধান করতে হবে কিভাবে এই :"আদি কোষের" উৎপত্তি হলো ? যেহেতু বিবর্তনবাদ সৃষ্টি কৌশলকে অস্বীকার করে আর অতি প্রাকৃতিক কোন প্রকার মধ্যস্থতাকে মেনে নেয় না, সেহেতু তা এতেই অটল থাকে যে, "আদিকোষ" কোন ডিজাইন, পরিকল্পনা বা কোন ব্যবস্থাপনা ছাড়াই প্রকৃতির নিয়মানুযায়ী এক আকস্মিক যোগাযোগের মাধ্যমে উৎপত্তি লাভ করেছে। এই মতবাদ অনুযায়ী, যুগপৎ ঘটনাসমূহের ফলস্বরূপই নিশ্চিতভাবে জড় বস্তুগুলোই একটি জীবকোষের জন্ম দিয়েছে । যাহোক, এটা এমনকি জীববিজ্ঞানের সবচেয়ে অনাক্রম্য নিয়মাবলীর সঙ্গে অসংগতিপূর্ণ একটি দাবী ।

## প্রাণী থেকে প্রাণীর উৎপত্তি

ডারউইন তার বইখানায় প্রাণের উদ্ভবের ব্যাপারটি কখনও উল্লেখ করেননি । জীবিত সত্তাগুলোর গঠন কাঠামো অত্যন্ত সরল- এ অনুমানের উপরই তার সময়কার বিজ্ঞানের আদি ধারণা প্রতিষ্ঠিত ছিল । মধ্যযুগ থেকে স্বতঃস্ফুর্ত উৎপাদনের নামে একটি থিওরী দাবী করে আসছিল যে, জড় বস্তুগুলো একত্রে মিলিত হয়েই জীবের উদ্ভব ঘটায়, আর এটি তখন বিস্তৃতভাবে গ্রহনযোগ্য ছিল । সাধারণভাবে বিশ্বাস করা হতো যে, ফেলে রাখা অতিরিক্ত খাবার থেকে পোকামাকড় আর গম থেকে ইদুঁর জন্ম নেয় । এই মতবাদটি প্রমাণের জন্য মজার মজার গবেষণা চালানো হতো । একটি ময়লা কাপড়ের টুকরায় কিছু গম ফেলে রাখা হতো আর কিছুক্ষন পরেই তা থেকে ইদুঁর

জন্ম নেবে বলে বিশ্বাস করা হতো । অনুরূপভাবে মাংস থেকে কীটের উৎপত্তিকে স্বতঃস্ফুর্ত উৎপাদনের একটি প্রমাণ বলে ধারণা করা হতো । অবশ্য মাত্র কিছু দিনের ব্যবধানে এটা বোঝা গেলো যে, কীটগুলো মাংসে স্বতঃস্ফুর্ত ভাবে হাজির হয় না, বরং খালি চোখে দেখা যায় না- এমন কিছু লার্ভার আকারে মাছিগুলো কীটগুলোকে বহন করে নিয়ে আসে ।

এমনকি যে সময়ে ডারউইন তার "প্রজাতির উৎপত্তি" বইখানা লিখেন তখনও ব্যাকটেরিয়া জড়বস্তু থেকে জন্ম নেয় এমন একটি বিশ্বাস বিজ্ঞান জগতে বহুল প্রচলিত ছিল ।

অবশ্য ডারউইনের বই প্রকাশনার মাত্র পাঁচ বছরের মাথায় লুই পাস্তুর দীর্ঘ পর্যবেক্ষন ও গবেষণা শেষে তার ফলাফল ঘোষণা করেন যা ডারউইনের মতবাদের ভিত্তি স্থাপনকারী এই স্বতঃস্ফুর্ত উৎপাদনকে মিথ্যা প্রমাণ করে । ১৮৬৪ সনে, সর্বোনে দেয়া এক বিজয়ী লেকচারে লুই পাস্তুর বলেন, "এই সরল গবেষণাটি হতে প্রাপ্ত গুরুতর আঘাত থেকে স্বতঃস্ফুর্ত উৎপাদনের মতবাদটি আর কখনও পূর্বাবস্থায় ফিরে আসতে সক্ষম হবে না ।"

বিবর্তন মতবাদটির সমর্থকগণ পাস্তুরের এই তথ্যগুলোকে দীর্ঘ সময় ঠেকিয়ে রেখেছিলেন। অবশ্য বিজ্ঞানের জয়যাত্রা যখন জীবকোষের অতি জটিল গঠনের জট খোলে দিল, তার সাথে সাথে যুগপৎ ঘটনায় প্রাণের অস্তিত্বে আসার কাল্পনিক ধারণা সম্পূর্ণ অচলাবস্থার সম্মুখীন হলো ।

## বিংশ শতাব্দীতে সিদ্ধান্তহীন প্রচেষ্টা

*খ্যাতনামা রুশ জীববিজ্ঞানী আলেকজান্ডার ওপারিন প্রথম সেই বিবর্তনবাদী, যিনি বিংশ শতাব্দীতে "প্রাণের উৎপত্তি" বিষয়টিকে নিয়ে আবার নূতন করে কাজ শুরু করেন । ১৯৩০ সনে তিনি বিভিন্ন থিসিস নিয়ে এগিয়ে আসলেন আর প্রমাণ করতে চেষ্টা করলেন যে, জীবকোষ যুগপৎ ঘটনায় উৎপন্ন হতে পারে। অবশ্য এবারও এই অনুসন্ধানগুলো ব্যর্থতায় পর্যবসিত হলো আর ওপারিনকে নিম্নোক্ত স্বীকারোক্তিখানি করতে হলো :"যাইহোক, দুর্ভাগ্যজনকভাবে হয়তোবা কোষের উৎপত্তি বিষয়ক সমস্যাটি জীবসমূহের বিবর্তনের পূর্ণাঙ্গ অনুসন্ধানের বেলায় সবচেয়ে অস্পষ্ট একটি পয়েন্ট হিসেবে রয়ে গিয়েছে ।"*[২৫]

ওপারিনের বিবর্তনবাদী অনুসারীগণ প্রাণের উৎপত্তি বিষয়ক সমস্যাটির সমাধানকল্পে নানা পরীক্ষা নিরীক্ষা চালিয়ে যেতে লাগলেন। এই পরীক্ষাগুলোর মাঝে সবচেয়ে সুপরিচিত পরীক্ষাটি সম্পন্ন করেন **১৯৫৩** সনে আমেরিকান রাসায়নবিদ ষ্ট্যানলী মিলার। তিনি গবেষনার একটি সেট তৈরী করলেন; তার যুক্তি অনুযায়ী পৃথিবীর আদি পরিবেশে কিছু গ্যাস বিদ্যমান ছিল যেগুলোকে তিনি তার সেটটিতে একসংগে মেশালেন ও মিশ্রণটিতে শক্তি সরবরাহ করলেন। অবশেষে সংশ্লেষণ প্রক্রিয়ায় বিভিন্ন ধরণের জৈব অণু (এমাইনো এসিড) উৎপন্ন করলেন যেগুলো প্রোটিনের গঠন কাঠামোতে বিদ্যমান থাকে ।

সে সময় এ পরীক্ষাটিকে বিবর্তনের স্বপক্ষে একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ বলে উপস্থাপন করা হয়েছিল । কিন্তু কয়েক বছর যেতে না যেতেই এ গবেষণাটি অগ্রহনযোগ্য বলে প্রকাশিত হলো; কেননা গবেষণায় যে পরিবেশ ব্যবহৃত হয়েছিল তা পৃথিবীর প্রকৃত অবস্থা হতে ছিল অনেক অনেক ভিন্ন ।[২৬]

দীর্ঘ নীরবতার পর মিলার স্বীকার করে নিলেন যে, তিনি যে পরিবেশের মাধ্যম ব্যবহার করেছিলেন তা বাস্তবে নেই ।[২৭]

বিংশ শতাব্দী জুড়ে প্রাণের উৎপত্তির ব্যাখ্যা দানে বিবর্তনবাদীদের পেশকৃত সমস্ত প্রচেষ্টা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হলো । সান্ডিয়াগো স্ক্রিপস ইনস্টিটিউট থেকে ভূ- রসায়নবিদ, জেফরী বাদা, **১৯৯৮** সনে আর্থ ম্যাগাজিনে প্রকাশিত এক অনুচ্ছেদে এ সত্যটি মেনে নিয়ে বলেন :

*আজ এই বিংশ শতাব্দী ছেড়ে যাওয়ার প্রাক্কালেও সবচেয়ে বড় যে অমীমাংসিত সমস্যাটির মুখোমুখি আমরা হচ্ছি, যেমনটি হয়েছিলাম এ শতকে প্রবেশের সময়; সমস্যাটি হল পৃষ্ঠে- ভূ : প্রাণের সঞ্চার হলো কিভাবে?*[২৮]

## জীবদেহের জটিল গঠন

প্রাণের উৎপত্তি প্রসংগে বিবর্তন মতবাদ এমন একটি বড় ধরণের অচলাবস্থায় সমাপ্ত হওয়ার একটি প্রাথমিক কারণ যে সমস্ত জীবগুলো অত্যন্ত সরল গঠনের বলে বিবেচনা করা হয়েছিল,

সেগুলোরও অবিশ্বাস্য ধরণের জটিল গঠন রয়েছে। মানবপ্রযুক্তি দ্বারা তৈরী সমস্ত পণ্যের চেয়ে একটি জীবকোষ অধিকতর জটিল । আজ এই সময়ে এমনকি পৃথিবীর সবচেয়ে উন্নত ল্যাবরেটরীগুলোতেও অজৈব বস্তুগুলোকে একত্রিত করে একখানি জীবকোষ তৈরী করা যায় না ।

একখানি কোষ তৈরীতে প্রয়োজনীয় শর্তাদির পরিমাণ এত বিপুল যে এটাকে যুগপৎ ঘটনায় সংঘটিত হওয়ার ব্যাখ্যা দেয়াই ভার । কোষের গঠন কাঠামোতে ব্লক হিসেবে ব্যবহৃত হয় যে প্রোটিনগুলো,   তাদের প্রতিটি গড়ে ৫০০ এমাইনো এসিড নিয়ে গঠিত;   যুগপৎভাবে সংশ্লেষন প্রক্রিয়ায় সে প্রোটিনগুলোর তৈরী হওয়ার সম্ভাবনা $১০^{৯৫০}$ ভাগেরও এক ভাগ। গাণিতিকভাবে $১০^{৫০}$ ভাগের চেয়ে কম কিংবা ক্ষুদ্রতর যে কোন সম্ভাবনা বাস্তবে অসম্ভব।

কোষের কেন্দ্রে অবস্থিত ডিএকটি অবিশ্বাস্য ডাটা ব্যাংক .এ.এন.,   যা বংশগতির সমস্ত তথ্যাবলী বহন করে থাকে । গণনা করে দেখা গেছে যে,   ডিতে যে তথ্যাদি সংকলিত রয়েছে তা .এ.এন. ভলিউম এনসাইক্লোপেডিয়ার এক বিশালাকায় ৯০০ যদি লিপিবদ্ধ করা যেতো তাহলে তা লাইব্রেরী তৈরী করতো,   যেখানে প্রতি ভলিউম এনসাইক্লোপেডিয়া রয়েছে ৫০০ পৃষ্ঠা ।

এই পয়েন্টটিতে একটি উভয় সংকট তৈরী হয় : ডি.এন.এ. কেবলমাত্র বিশেষ ধরণের কিছু প্রোটিনের (এনজাইম) সহায়তায় বিভাজিত হয় । আবার এ এনজাইমগুলো সংশ্লেষনের মাধ্যমে তৈরী হওয়ার যাবতীয় তথ্যাবলী ডি.এন.এ. এর গায়ে সংকলিত থাকে । আর এই তথ্যাবলী থেকেই সংশ্লেষণ প্রক্রিয়াগুলো বুঝে নেয়া যায় । দেখা যাচ্ছে যে,   উভয়েই পরস্পর পরস্পরের উপর নির্ভরশীল । আর তাই কোষ বিভাজনের সময় তাদের উভয়কে একই সঙ্গে বর্তমান থাকতে হবে। এ কারণেই প্রাণ নিজে নিজেই উৎপত্তি লাভ করবে- এরূপ কাল্পনিক সম্ভাবনাটি বাতিল হয়ে যায়। ক্যালিফোর্নিয়ায় সান্ডিয়াগো ইউনভার্সিটির সুনামধন্য বিবর্তনবাদী,   অধ্যাপক রেসলি অরগেল,   সায়েন্টিফিক এমেরিকান ম্যাগাজিনের ১৯94 সনের সেপ্টেম্বরের প্রকাশনায় একটি আর্টিকেলে এ সত্যটি স্বীকার করে বলেন :

এটা একেবারেই অসম্ভব যে গঠনগতভাবে জটিল প্রোটিন ও এমাইনো এসিড উভয়েই একই সময়ে একই জায়গা হতে উৎপন্ন হবে । তদুপরি এদের একটি ছাড়া অন্যটির অস্তিত্ব অসম্ভব

বলেই মনে হয় । আর তাই, প্রথম দৃষ্টিতে একজন এ সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারেন যে, প্রকৃতপক্ষে প্রাণ কখনও রাসায়নিক পদ্ধতিতে তৈরী হতে পারতো না ।[২৯]

বলতে দ্বিধা নেই যে, যদি প্রকৃতিগত কারণে প্রাণের উৎপত্তির সম্ভাবনা না থাকে, তবে তখন এটাই মেনে নিতে হবে যে, এক অতিপ্রাকৃত বা অলৌকিক উপায়েই প্রাণের সঞ্চার ঘটেছে। এ সত্যটুকু সুস্পষ্টভাবে সেই বিবর্তন মতবাদকে বাতিল ঘোষণা করে যার প্রকৃত উদ্দেশ্য "সৃষ্টি কর্ম" কে অস্বীকার করা।

*জীবনের অবিশ্বাস্য রকমের জটিল গঠন বিবর্তন থিওরীকে নস্যাৎ করার মত একটি বিষয়। জীব কোষের কেন্দ্রে অবস্থিত ডি.এন.এ এটিরই একটি উদাহরণ। ডি.এন.এ এক প্রকার ডাটা ব্যাংক যা চারটি ভিন্ন ভিন্ন অনু সজ্জিত হয়ে তৈরী হয়। জীবসত্ত্বার দৈহিক বৈশিষ্ট্যগুলোর কোড বহন করে এই ডাটা ব্যাংক। গণনা করে দেখা গেছে যে, যদি মানুষের ডি.এন.এ লিখার ব্যবস্থা করা হয় তবে তা হবে ৯০০ ভলিউম এনসাইক্লোপেডিয়ার সমান। প্রশ্নাতীতভাবেই এই অসাধারণ তথ্যটি নিশ্চিৎভাবে হঠাৎ যুগপত সংঘটনের ধারণাটি ভ্রান্ত বলে প্রমাণ করে।*

## কাল্পনিক বিবর্তন প্রক্রিয়াসমূহ

দ্বিতীয় যে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি ডারউইনের মতবাদকে বাতিল করে দেয় তা হলো- "বিবর্তনের প্রক্রিয়াবলী" হিসেবে যে দুটি ধারণার অবতারনা করা হয়েছিল সেগুলোর বাস্তবে বিবর্তন ঘটানোর কোন ক্ষমতা নেই বলে বুঝা গিয়েছে ।

ডারউইন "প্রাকৃতিক নির্বাচন" প্রক্রিয়াকে তার উত্থাপিত বিবর্তনবাদের ভিত্তি হিসাবে দাঁড় করান। তিনি এই পদ্ধতির উপর যে বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন তা তার বইটির নামকরণেই স্পষ্ট হয়ে উঠে : "প্রজাতির উৎপত্তি, প্রাকৃতিক নির্বাচনের মধ্য দিয়ে ।......."

প্রাকৃতিক নির্বাচন বিবেচনা করে যে, যে সমস্ত জীব অধিকতর শক্তিশালী ও যেগুলো তাদের আবাস ভূমির স্বাভাবিক অবস্থায় অধিকতর উপযোগী বা যোগ্যতর বলে বিবেচিত হয় তারাই

জীবন সংগ্রামে টিকে থাকবে। উদাহরণস্বরূপ, কোন এক হরিণের পাল যখন অন্য কোন হিংস্র জন্তুর কবলে পতিত হয়, তখন যে হরিণগুলো অধিকতর দ্রুত বেগে দৌড়ে যেতে পারে তারাই কেবল টিকে থাকবে । অবশ্য প্রশ্নাতীতভাবেই, এই পদ্ধতি কোন হরিণের মাঝে বিবর্তন ঘটায় না আর একে বিকশিত করে অন্য কোন প্রজাতি, যেমন, ঘোড়ায় রূপান্তরিত- করে না ।

*অতএব বিবর্তন ঘটানোর কোন ক্ষমতাই প্রাকৃতিক নির্বাচনের নেই । ডারউইন নিজেও এ সত্যটি অবগত ছিলেন আর তাকে তার প্রজাতির উৎস নামক বইটিতে নিম্ন লিখিত উক্তিখানি করতে হয়েছিল :"প্রতিটি ক্ষেত্রে অনুকূল বৈষম্য কিংবা বৈচিত্র্য না ঘটা পর্যন্ত প্রাকৃতিক নির্বাচন কিছুই করতে পারে না ।"*[৩০]

## ল্যামার্কের প্রভাব

তাহলে কিভাবে এই "অনকূল পরিবর্তনগুলো" ঘটবে ? ডারউইন তার যুগের বিজ্ঞানের আদি ধারণার দৃষ্টিকোণ থেকে এ প্রশ্নের উত্তর প্রদানের চেষ্টা করেন । ডারউইনের পূর্ব যুগে বিদ্যমান ফ্রান্সের জীববিজ্ঞানী ল্যামার্কের মতানুসারে, জীব তাদের জীবদ্দশায় তাদের অর্জিত বৈশিষ্ট্যগুলো তাদের পরবর্তী প্রজন্মে প্রেরণ করেছিল আর সেগুলো প্রজন্ম হতে প্রজন্মান্তরে একত্রীভূত হয়ে নূতন প্রজাতির প্রাণীর উদ্ভব ঘটিয়েছিল । যেমন, ল্যামার্কের মতে, জিরাফগুলো এক ধরণের কৃষ্ণকায় হরিণ থেকে বিকশিত হয়েছিল । যখন হরিণগুলো উঁচু বৃক্ষের পাতা খাওয়ার আপ্রাণ চেষ্টা করত, তখন তাদের ঘাড় একটু একটু করে প্রসারিত হয়ে এক প্রজন্ম হতে অন্য প্রজন্মে লম্বা হয়েছে ।

ডারউইন নিজেও একই ধরণের উদাহরণ দিয়েছেন; দৃষ্টান্ত স্বরূপ তিনি তার প্রজাতির উৎস বইটিতে বলেছেন যে খাবারের খোঁজে পানিতে নামতে গিয়ে কিছু ভালুক কালের পরিক্রমায় নিজেরাই তিমিতে রূপান্তরিত হয়েছিল ।[৩১]

যাই হোক, বিংশ শতাব্দীতে ম্যান্ডেল উত্তরাধীকার সূত্রাবলী আবিষ্কার করলেন আর বংশানুগতি সম্বন্ধীয় বিজ্ঞান কর্তৃক সে সূত্রগুলোর যথার্থতা যাচাই করা হলো । বংশানুগতির বা উত্তরাধীকার

সূত্রগুলো সে সময়ে আলোড়ন সৃষ্টি করে আর অর্জিত বৈশিষ্ট্যগুলো পরবর্তী প্রজন্মে প্রেরিত হয়- এ ধরণের উপাখ্যানটি নাকচ করে দেয়। এভাবেই প্রাকৃতিক নির্বাচন, বিবর্তন প্রক্রিয়া হিসেবে সমর্থন পেতে সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয় ।

## নব্য- ডারউইনবাদ এবং মিউটেশন

ডারউইন ভক্তরা ১৯৩০ সালের শেষ দিকে একটি সমাধানে পৌছার লক্ষ্যে "আধুনিক সংশ্লেষন থিওরী" কিংবা আরো সাধারণভাবে যেটি নব্য- ডারউইনবাদ নামে পরিচিত, সেটিকে এগিয়ে নিয়ে যান। নব্য- ডারউইনবাদে মিউটেশন প্রক্রিয়াটি যোগ করা হয়; আর মিউটেশন হলো- বাহ্যিককিছু কারণ যেমন, বিকিরণের )Radiationকিংবা সংযোজন ভ্রান্তির ( ( Replication errorকারণে জীবদেহের জীনে সংঘটিত বিকৃতি (; উপরোক্ত ফ্যাক্টরগুলোর জন্য প্রাকৃতিক মিউটেশনের সঙ্গে "অনুকল পরিবর্তনের কারণ" হিসেবে জীনে এ বিকৃতি ঘটে থাকে ।

বর্তমানে এই পৃথিবীতে বিবর্তনের মডেল হিসেবে আমরা যেটিকে দেখতে পাই তাই হলো নব্য- ডারউইনবাদ । থিওরিটি এটাই বলে যাচ্ছে যে, পৃথিবীতে মিলিয়ন মিলিয়ন জীব এসেছে একটি প্রক্রিয়ার মাধ্যমে, যদ্দারা জীবগুলোর জটিল অঙ্গাদি যেমন: কান, চোখ, ফুসফুস আর পাখাসমূহে "মিউটেশন" কিংবা জিনগত বিশৃংখলা সংঘটিত হয় । তথাপি একটি নির্জলা বৈজ্ঞানিক তথ্য রয়েছে যা এ থিওরিটিকে সম্পূর্ণরূপে বর্জন করে :

মিউটেশন কখনো জীবদেহের বিকাশ বা উন্নয়ন ঘটায় না বরং তার ক্ষতিসাধন করে ।

এর কারণটি অত্যন্ত সাধারণ : ডি.এন.এ. এর রয়েছে একটি অতি জটিল গঠন আর এলোপাতাড়ি যে কোন পরিবর্তন এ কাঠামোটির ক্ষতি সাধন করে । আমেরিকার জিনতত্ত্ববিদ বি.জি. রাঙ্গানাথান বিষয়টি এভাবে ব্যাখ্যা করেন :

মিউটেশন হলো ক্ষুদ্র, এলোপাতাড়ি আর ক্ষতিকর প্রক্রিয়া। এগুলো কদাচিৎ ঘটে আর ঘটলেও ভাল লক্ষণ যে, এরা কার্যকরী হবে না। মিউটেশনের ৪টি বৈশিষ্ট্য এটাই সূচিত করে যে, প্রক্রিয়াটি কখনো বিবর্তনজনিত বিকাশ ঘটায় না। অত্যন্ত জটিল জীবদেহে এলোপাতাড়ি

পরিবর্তনগুলো হয় ব্যর্থ নচেৎ ক্ষতিকর বলে পরিলক্ষিত হয়। একটি ঘড়িতে এলোপাতাড়ি পরিবর্তন একে কোন উন্নতর ঘড়িতে রূপান্তরিত- করতে পারে না। খুব সম্ভবত এতে ঘড়িটির ক্ষতি হবে অথবা বড়জোর তা ব্যর্থ হবে। ভূমিকম্প কখনও নগরীর সমৃদ্ধি ঘটায় না বরং এর ধ্বংসই ডেকে আনে।[৩২]

এটা কোন আশ্চর্যের কথা নয় যে, মিউটেশনের কোন উদাহরণই কার্যকরী হয় না, তার মানে, মিউটেশন প্রক্রিয়া জীনের গায়ে বিদ্যমান সংকেতলিপির কোন প্রকার উন্নয়ন ঘটায়- এমন কোন দৃষ্টান্ত পরিলক্ষিত হয় না। সব ধরণের মিউটেশনই ক্ষতিকর বলে প্রমাণিত হয়েছে। মিউটেশনগুলো- যাদের বিবর্তন প্রক্রিয়া বলে উপস্থাপন করা হয়েছে, তারা প্রকৃতপক্ষে জীবদেহে জীনের কতকগুলো সংঘটনমাত্র, যেগুলো বরং দেহের ক্ষতির কারণ হয়ে দাড়ায় বলেই দেখা গিয়েছে। আর সাথে সাথে তা জীবগুলোকে অচল ও পঙ্গু করে দেয়। (মানব দেহে মিউটেশনের ক্ষতিকর প্রভাবের সবচেয়ে সাধারণ উদাহরণ- ক্যান্সার ) এতে কোন সন্দেহ নেই যে, কোন ধ্বংসাত্মক প্রক্রিয়া কখনো কোন "ক্রমবিকাশ পদ্ধতি" হতে পারে না। অন্যদিকে প্রাকৃতিক নির্বাচনও "নিজে নিজে কিছু করতে পারে না " যা ডারউইন নিজেও মেনে নিয়েছেন। এই তথ্যগুলো আমাদের দেখিয়ে দিচ্ছে যে প্রকৃতিতে কোন "বিবর্তন প্রক্রিয়া" বিদ্যমান নেই। যেহেতু "বিবর্তনের কোন পদ্ধতিরই" অস্তিত্ব নেই সেহেতু বিবর্তন নামের কাল্পনিক কোন প্রক্রিয়াও সংঘটিত হয়নি।

## ফসিল বা জীবাশ্ম রেকর্ডঃ মধ্যবর্তী কোন আকৃতির অস্তিত্ব নেই

*বিবর্তন মতবাদ কর্তৃক প্রস্তাবিত- কোন দৃশ্যকল্প সংঘটিত হয়নিএ সত্যটির সবচেয়ে পরিষ্কার - সাক্ষ্য বহন করছে"ফসিল রেকর্ড"।*

বিবর্তন মতবাদ অনুসারে প্রতিটি জীব তার পূর্বসুরী থেকে জন্ম নিয়েছে। পূর্বে বিদ্যমান কোন প্রজাতি সময়ের ধারাবাহিকতায় অন্য কোন প্রজাতিতে রূপান্তরিত হয়েছে আর এভাবে বাকী

প্রজাতিগুলোও অস্তিত্বে এসেছে। এ মতবাদ অনুসারে, এই রূপান্তর প্রক্রিয়া মিলিয়ন মিলিয়ন বছর ধরে ধীর গতিতে সম্পন্ন হয়েছে।

এই যদি ব্যাপার হতো তখন অবশ্যই অসংখ্য মধ্যবর্তী প্রজাতির অস্তিত্ব থাকত আর এরা দীর্ঘ পরিবর্তন কাল জুড়ে বর্তমান থাকতো ।

উদাহরণস্বরূপ, অতীতে কিছু অর্ধমাছঅর্ধসরীসৃপ এর অস্তিত্ব বিদ্যমান থাকত/ তাদের পূর্ব থেকে বিদ্যমান মাছের বৈশিষ্টের সঙ্গে সরীসৃপের কিছু বৈশিষ্ট্য যোগ হতো। কিংবা কতক সরীসৃপ পাখি জাতীয় প্রাণী থাকতো যাদের পূর্বে রয়ে যাওয়া সরীসৃপের বৈশিষ্টের সংগে পাখির বৈশিষ্ট্য যোগ হতো। যেহেতু এরা একরূপ হতে অন্য রূপে উত্তরণের সময় জন্ম নিত সেহেতু তাদের অক্ষম, ত্রুটিপূর্ণ, পঙ্গু জীব হিসেবেই বিদ্যমান থাকার কথা । বিবর্তনবাদীরা এমন সব কাল্পনিক জীবের কথা বলে থাকেন যা অতীতে তাদের রূপ পরিবর্তনকালীন সময়ে “দুয়ের মধ্যবর্তী আকারে” ( intermediate forms) বিদ্যমান ছিল বলে তাদের বিশ্বাস ।

সত্যিই যদি এ ধরণের প্রাণীর অস্তিত্ব থাকত, তারা সংখ্যা ও বৈচিত্র্যে হতো মিলিয়ন থেকে বিলিয়ন অবধি। আরো গুরুত্বপূর্ণ যে, অদ্ভুত এই প্রাণীগুলোর দেহাবশেষ ফসিল রেকর্ডে বিদ্যমান থাকার কথা। প্রজাতির উৎপত্তি বইটিতে ডারউইন বলেছেন :

আমার থিওরীটি যদি সত্যি হয়ে থাকে তবে একই গ্রুপের সমস্ত প্রজাতির মাঝে ঘনিষ্ঠ সংযোগ স্থাপনকারী মধ্যবর্তী গঠনের এ ধরণের প্রাণীর সংখ্যা নিশ্চিত ভাবেই হবে অসংখ্য ....... ।

*ফলস্বরূপ তাদের অতীতে বিদ্যমান থাকার প্রমাণ কেবলমাত্র তাদের ফসিলসমূহে থেকে পাওয়া যেতে পারে ।*[৩৩]

## ডারউইনের স্বপ্ন ভঙ্গ হলো

যদিও বিবর্তনবাদীরা ঊনিশ শতকের মধ্যভাগ থেকে শুরু করে সমগ্র বিশ্ব জুড়ে ফসিল খুঁজে পাওয়ার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন, তথাপি এখনও পর্যন্ত কোথাও কোন অন্তর্বর্তীকালীন গঠনের প্রাণী খুঁজে পাওয়া যায়নি। মাটি খুঁড়ে তুলে আনা সমস্ত ফসিলগুলো বিবর্তনবাদীদের

প্রত্যাশার বিপরীত তথ্য প্রদর্শন করে এটাই প্রমাণ করছে যে, পৃথিবীতে প্রাণ এসেছে আকস্মিকভাবে আর পরিপূর্ণ আকার নিয়ে।

প্রখ্যাত ব্রিটিশ জীবাশ্মবিদ, ডিরেক ভি. এগার নিজে একজন বিবর্তনবাদী হয়েও তিনি এ সত্যটি মেনে নিয়েছেন এভাবে :

*যে তথ্যটি বের হয়ে আসে তাহলো যে, ফসিলগুলো বর্গ বা প্রজাতিএ দুয়ের যে কোন পর্যায়েই - থাকুকনা কেন, যেকোন একটি স্তরে আমরা যদি এদের পুংখানুপুংখভাবে পরীক্ষা করে দেখি, তাহলে বারংবার আমরা খুঁজে পাই কোন ক্রমান্বয় বিবর্তন নয়, বরং এক গ্রুপের পরিবর্তে অন্য আরেকটি গ্রুপের যেন আকস্মিক বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে ।*[৩৪]

ফসিল রেকর্ড থেকে এটাই বুঝা যাচ্ছে যে, সমস্ত জীব প্রজাতিই কোন দুইটি প্রজাতির অন্তর্বর্তীকালীন কোন গঠন নিয়ে নয় বরং পূর্ণাঙ্গ রূপ নিয়ে আবির্ভূত হয়েছে। এটি ডারউইনের অনুমানের ঠিক উল্টো। এটি এ বিষয়টিরও একটি অত্যন্ত জ্বলন্ত প্রমাণ যে, সমস্ত জীবকে সৃষ্টি করা হয়েছে। সমস্ত জীব যে পূর্ববর্তী কোন প্রজন্ম হতে বিকশিত হয়ে নয় বরং আকস্মিকভাবে এবং সম্পূর্ণ অখণ্ড রূপে আবির্ভূত হয়েছে- তার একমাত্র ব্যাখ্যা এটিই হতে পারে যে তাকে সৃষ্টি করা হয়েছে । সুপরিচিত বিবর্তনবাদী ও জীববিদ ডগলাস ফুতুইমা ও এ সত্যটি স্বীকার করে নিয়েছেন :

সৃষ্টি আর বিবর্তনএ দুয়ের মাঝে প্রাণের উৎপত্তির ব্যাখ্যাগুলো ফুরিয়ে যায়। প্রাণীসমূহ - থিবীতে এসেছে হয় পূর্ণাঙ্গরূপে নচেৎ আসেনি। যদি তারা পূর্ণাঙ্গরূপে না আসে তবে তারা পৃ অবশ্যই পূর্বে বিদ্যমান কোন প্রজাতি হতে বিবর্তন প্রক্রিয়ায় উদ্ভূত হয়েছে । যদি তারা পূর্ণাঙ্গ রূপেই এসে থাকে তবে বাস্তবিকভাবে অবশ্যই তারা কোন সর্বশক্তিমান মহাকৌশলী কর্তৃক সৃষ্ট হয়েছে।[৩৫]

ফসিলগুলো থেকে এটাই প্রতীয়মান হয় যে, ভূ- পৃষ্ঠে প্রাণসত্ত্বার আবির্ভাব ঘটেছে নিখুঁত ও পূর্ণাঙ্গরূপে। তাতে বুঝা যাচ্ছে যে, "প্রজাতির উৎপত্তি" হয়েছে সৃষ্টি কৌশলের মধ্য দিয়ে, বিবর্তনের মাধ্যমে নয়; আর এটা ডারউইনের অনুমানের ঠিক বিপরীত ।

## মানব- বিবর্তনের কাহিনী

*মানবজাতির উৎসএটিই বিবর্তনবাদ ভক্তদের সর্বাধিক উত্থাপিত আলোচনার বিষয়। - ডারউইনের সমর্থকগণ এই বলে দাবী করেন যে, এখনকার মানবজাতি কিছু গরিলা বা শিম্পাঞ্জী জাতীয় প্রাণী থেকে বিকশিত হয়েছে। কথিত এই বিবর্তন প্রক্রিয়া ৪৫ মিলিয়ন বছর পূর্বে শুরু হয়েছিল বলে দাবী করা হয়; আরো দাবী করা হয় যে, বিবর্তন প্রক্রিয়ার সময় এখনকার মানবজাতি তার ও তার পূর্বপুরুষদের মাঝামাঝি কোন "অন্তর্বর্তীকালীন রূপে" বিদ্যমান ছিল। সম্পূর্ণ কাল্পনিক এই রূপরেখা থেকে চারটি মৌলিক শ্রেণীর একটি তালিকা তৈরী করা যায় :*

১ । অষ্টোলোপিথেকাস

২ । হোমো হেবিলিস

৩ । হোমো ইরেকটাস

৪ । হোমো সেপিয়েনস

বিবর্তনবাদীগণ তথাকথিত মানবজাতির পূর্বপুরুষের নাম রেখেছেন "অষ্ট্রেলো পিথেকাস" অর্থাৎ "দক্ষিন আফ্রিকান বানর"। প্রকৃতপক্ষে, এই জীবগুলো বিলুপ্ত হয়ে যাওয়া বানর বৈ কিছু নয়। ইংল্যান্ড ও আমেরিকা থেকে দুজন জগৎ বিখ্যাত এনাটমিষ্ট, লর্ড সলী যুকারম্যান এবং অধ্যাপক চার্লস অক্সনার্ড বিভিন্ন অষ্টোলোপিথেকাসের নমুনার উপর গবেষণা চালিয়ে দেখিয়েছেন যে, এগুলো সাধারণ এক প্রকার গরিলা শ্রেণীর; এরা বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছে আর মানবজাতির সাথে এদের কোন সাদৃশ্য খুঁজে পাওয়া যায় নি।[৩৬]

বিবর্তনবাদীরা মানব বিবর্তনের পরবর্তী পর্যায়কে "হোমো" বা "মানুষ" নামে শ্রেণীকরণ করেছেন। তাদের দাবী অনুসারে হোমো শ্রেণীর জীবগুলো অষ্ট্রেলোপিথেকাসের চেয়ে উন্নতর পর্যায়ের। বিবর্তনবাদীরা এই প্রাণীগুলোর বিভিন্ন ধরণের জীবাশ্ম নিয়ে এদের নির্দিষ্ট বিন্যাসে সাজিয়ে এক অলীক বিবর্তন বিন্যাস বা পরিকল্পনা তৈরী করেছেন। এই বিভিন্ন শ্রেণীগুলোর মাঝে বিবর্তন প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়েছে বা এদের মাঝে বিবর্তনের সম্পর্ক রয়েছে এমন কোন প্রমাণ কখনো দাড় করানো যায়নি; তাই এই পরিকল্পনা সম্পূর্ণ কাল্পনিক। বিংশ শতাব্দীতে বিবর্তন

মতবাদের একজন অগ্রবর্তী সমর্থক আর্নস্ট মায়ার তার দীর্ঘ বিতর্ক নামক বইটিতে লিখেছেন যে, "হোমো সেপিয়েনস পর্যন্ত অগ্রসর চেইনটি হঠাৎ হারিয়ে গেছে।"[৩৭]

বিবর্তনবাদীগণ বিভিন্ন্ প্রজাতির মাঝে যোগসূত্র স্থাপনকারী এই চেইনটির রূপরেখা টেনেছেন এভাবেঃ অষ্ট্রেলোপিথেকাস> হোমো হেবিলিস> হোমো ইরেকটাস> হোমো সেপিয়েনস। এ চেইনটি থেকে বিবর্তনবাদীগণ দেখাতে চান যে, এই প্রজাতিগুলোর প্রত্যেকে একে অপরের আদি পুরুষ। অবশ্য বিবর্তনবাদীদের সাম্প্রতিক কালের প্রাপ্ত তথ্য হতে এটা পকাশিত হয়েছে যে, অষ্ট্রেলোপিথেকাস, হোমো হেবিলিস আর হোমো ইরেকটাস পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে একই সময়ে বিদ্যমান ছিল ।[৩৮]

তদুপরি, হোমো ইরেকটাস নামে শ্রেণীকৃত মানুষের একটি নির্দিষ্ট অংশ এখনও আধুনিক কাল পর্যন্ত বসবাস করে আসছে। হোমো সেপিয়েনস নিনদারথেলেনসিস ও হোমো সেপিয়েনস (আধুনিক মানুষ) একই সঙ্গে একই অঞ্চলে বসবাস করছিল ।[৩৯]

এ অবস্থা সুস্পষ্টভাবেই, প্রজাতিগুলোর একজন আরেকজনের উত্তরসূরী- এ দাবীটি দূর্বল করে দেয়। হার্ভার্ড ইউনিভার্সিটির জীবাশ্মবিদ, ষ্টীফেন জে গুল্ড, নিজে একজন বিবর্তনবাদী হয়েও বিবর্তন থিওরীর এই অচলাবস্থার ব্যাখ্যা করেছেন :

আমাদের এগিয়ে যাওয়ার ধাপ কি হতে পারে যদি তিনটি হোমিনিড বংশানুক্রম (এ.আফ্রিক্যানাস, বিশাল অষ্ট্রেলোপিথেসিনস, আর এইচ. হেবিলিস) একই সঙ্গে বর্তমান থাকে আর স্পষ্টভাবে কেউই একজন আরেকজন থেকে জন্ম নেয়নি ? অধিকন্তু, পৃথিবীতে থাকাকালীন অবস্থায় এই তিনটি হোমিনিডের কেউই বিবর্তনের কোন প্রবণতাই দেখায়নি ।[৪০]

সংক্ষেপে বললে, মানব বিবর্তনের গল্পটি চালু রাখতে "অর্ধেক বানর, অর্ধেক মানুষ" এমনতর প্রাণীর বিভিন্ন ছবি এঁকে তা প্রচার মাধ্যম ও কোর্স বইতে হাযির করা হয়; খোলাখুলি বলতে গেলে এগুলো নিছকই প্রচারণার মাধ্যমে করা হয়- যা বৈজ্ঞানিক ভিত্তিবিহীন একটি গল্প ছাড়া আর কিছুই নহে ।

ইংল্যান্ডের সবচেয়ে প্রখ্যাত ও শ্রদ্ধেয় বিজ্ঞানীদের মাঝে অন্যতম একজন লর্ড সলী যুকারম্যান এই বিষয়টির উপর বছরের পর বছর গবেষনা চালিয়েছেন, বিশেষ করে অষ্ট্রেলোপিথেকাসের উপর ১৫ বছর ধরে কাজ করার পর নিজে একজন বিবর্তনবাদী হয়েও এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে, "সত্যি বলতে কি, বানর সদৃশ প্রাণী থেকে মানুষ পর্যন্ত বিস্তৃত কোন বংশ তালিকার অস্তিত্ব নেই ।"

যুকারম্যান একটি আকর্ষণীয় "বিজ্ঞানের পরিসরও" তৈরী করেছিলেন। তার মতে যা সবচেয়ে বৈজ্ঞানিক তা থেকে শুরু করে যা সবচেয়ে অবৈজ্ঞানিক সে পর্যন্ত বিস্তৃত এই পরিসরটি তিনি গঠন করেন। এই পরিসরের প্রথম সারিতে থাকে সবচেয়ে বৈজ্ঞানিক বিষয়গুলো অর্থাৎ রসায়ন ও পদার্থ বিজ্ঞানযেগুলো কিনা বিজ্ঞানের সুনির্দিষ্ট ডাটা ফিল্ডের উপর প্রতিষ্ঠিত। এগুলোর পর - আসে জীব সম্পর্কিত বিজ্ঞান এবং তারপর সমাজ বিজ্ঞান। এই পরিসরের একদম শেষের দিকে আসে সবচেয়ে অবৈজ্ঞানিক বলে ধারণা করা হয় যে অংশগুলোকে, যেগুলো হলো :"অতিরিক্ত ইন্দ্রিয় উপলব্ধি" যেমন টেলিপ্যাথি ও ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় এবং পরিশেষে আসে "মানব বিবর্তন" । যুকারম্যান তার যুক্তির ব্যাখ্যা দিয়েছেন এভাবে :

আমরা তখন ঠিক বস্তুনিষ্ঠ সত্যের তালিকা থেকে অতিরিক্ত ইন্দ্রিয় উপলব্ধি কিংবা মানুষের ফসিলের ইতিহাসের ব্যাখ্যার মতো অনুমান নির্ভর জীব বিজ্ঞানের বিষয়গুলোর দিকে সরে যাই, যেখানে একজন বিশ্বাসী [বিবর্তনবাদী] লোকের কাছে সবকিছুই সম্ভব বলে বিবেচিত হয়- আর যেখানে [বিবর্তনে] অতি ভক্তরা কখনো কখনো একই সময়ে পরস্পর বিরোধী বিভিন্ন ব্যাপারও বিশ্বাস করতে সক্ষম হয় ।[৪১]

মানবজাতির বিবর্তনের গল্প গুটিকয়েক অন্ধ বিবর্তনবাদ ভক্ত ব্যক্তি কর্তৃক মাটি খুঁড়ে তুলে আনা ফসিলের পক্ষপাতদুষ্ট ব্যাখ্যাই দিয়েছে শুধু, কোন সফলতা খুঁজে পায়নি ।

*মানব বিবর্তনকে সমর্থন করার জন্য কোন ফসিল নেই। উল্টো ফসিল রেকর্ড প্রদর্শন করছে যে, বানর ও মানুষের মাঝে একটি দুস্তর- বাধা রয়েছে। এই সত্যটির সম্মুখীন হয়ে বিবর্তনবাদীরা*

*নির্দিষ্ট কিছু চিত্র আর মডেলের উপর তাদের আশা রাখেন। ফসিলের উপর তারা মুখাবরণ পরিয়ে দেন এলোপাতারিভাবে। আর অর্ধ- বানর আর অর্ধমানুষের মুখাবয়ব জোড়া লাগান।*

## চক্ষু ও কর্ণের টেকনোলজী

চোখ ও কানের অসাধারণ উপলব্ধি ক্ষমতা হলো আরেকটি বিষয়- যা সম্পর্কে বিবর্তন থিওরী নিরুত্তর থেকে যায় ।

চক্ষু সম্পর্কিত বিষয়ে যাওয়ার আগে চলুন, "আমরা কি প্রক্রিয়ায় দেখতে পারি ?"- এই প্রশ্নটির একটি সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রদান করি। কোন একটি বস্তু হতে আগত আলোক রশ্মি চোখের রেটিনার (অক্ষি গোলকের সর্ব পিছনের স্তর) উপর গিয়ে ঠিক উল্টোভাবে পতিত হয়। এখানে পতিত আলোক রশ্মিগুলো কিছু কোষের মাধ্যমে বৈদ্যুতিক সিগন্যালে রূপান্তরিত- হয় এবং পরে তারা "দৃষ্টির কেন্দ্র" নামে মস্তিস্কের পশ্চাৎদিকের একটি ছোট এলাকায় গিয়ে পৌচ্ছে। মস্তিস্কের- কেন্দ্রে এই ইলেকট্রিক সিগন্যাল গুলো বিভিন্ন ধারাবাহিক পরিবর্তনের পর একটি ইমেজ বা প্রতিবিম্ব হিসেবে গৃহীত হয়। চলুন, এই টেকনিক্যাল পটভূমি সম্পর্কে আমরা কিছু চিন্তা ভাবনা করে দেখি।

মস্তিষ্ক আলো থেকে সম্পূর্ণ রূপে সংরক্ষিত অবস্থায় রয়েছে। তার মানে হলো যে, মস্তিস্কের- ভিতর ভাগটা ঘন অন্ধকার আর যে জায়গাটিতে মস্তিষ্ক থাকে সেখানে আলোক পৌছে না। "দর্শনের কেন্দ্র" নামক স্থানটি একটি ঘন অন্ধকার জায়গা যেখানে কখনো আলো পৌছে না; এমনকি এটি আপনার জানা সমস্ত জায়গা সমূহের মাঝে সবচেয়ে অন্ধকার জায়গাও হতে পারে। যাই হোক, আপনি এই ঘন কালো অন্ধকারের মাঝেই একটি উজ্জ্বল আলোকিত জগৎ দেখতে পান।

চোখে তৈরী ইমেজ এত তীক্ষ্ম ও পরিষ্কার যে এমনকি বিংশ শতাব্দীর টেকনোলজিও তা অর্জন করতে সক্ষম হতে পারেনি। দৃষ্টান্ত স্বরূপ, আপনি আপনার বইটির দিকে তাকান, যে হাতগুলো দিয়ে বইটি ধরে আছেন সেগুলোর দিকেও তাকান, তারপর আপনার মাথা উঠিয়ে আপনার চার

পাশে লক্ষ্য করুন। আপনি কি কখনো অন্য কোথাও এটির মতো এমন তীক্ষ্ম ও স্বচ্ছ ইমেজ দেখেছেন ? এমনকি পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ টেলিভিশন নির্মাতাদের তৈরী সবচেয়ে প্রাগ্রসর টেলিভিশন পর্দাও আপনার জন্য এমনতর তীক্ষ্ম ইমেজ তৈরী করতে পারে না। এটি হলো ত্রিমাত্রিক, রঙ্গিন আর অত্যন্ত স্পষ্ট ইমেজ। একশ বছরেরও বেশী সময় ধরে এমনতর স্বচ্ছতা অর্জন করার চেষ্টা করে যাচ্ছেন হাজার হাজার ইঞ্জিনিয়র। কারখানা, বড় বড় জায়গা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, অনেক গবেষনা করা হয়েছে, এই উদ্দেশ্যে বহু পরিকল্পনা ও ডিজাইন করা হয়েছে। আবার টি .ভি. পর্দা এবং আপনার হাতে ধরা বইটির দিকে তাকান। তীক্ষ্মতা ওস্বচ্ছতার ক্ষেত্রে আপনি বিরাট এক পার্থক্য খুঁজে পাবেন। অধিকন্তু, টেলিভিশন পর্দা আপনাকে দ্বিমাত্রিক ছবি প্রদর্শন করে, যেখানে আপনার চোখ দিয়ে গভীরতাসহ একটি ত্রিমাত্রিক ছবি আপনি দেখতে পান।

বহু বছর ধরে হাজার হাজার ইঞ্জিনিয়ার একটি ত্রিমাত্রিক টেলিভিশন তৈরীর আর চোখের সমান দর্শন গুণ অর্জনের চেষ্টা চালাচ্ছেন। হ্যাঁ, তারা ত্রিমাত্রিক একটি টেলিভিশন সিস্টেম আবিষ্কার করেছেন বটে; তবে তা একটি কৃত্রিম ত্রিমাত্রা মাত্র। পশ্চাৎপটটি অধিকতর ঘোলাটে, পুরোভূমিটি একটি পেপার সেটিং এর মতো দেখা যায়। চোখের ন্যায় স্বচ্ছ আর পরিষ্কার ছবি তৈরী করা কখনো সম্ভব হয়ে উঠেনি। ক্যামেরা ও টেলিভিশন উভয় ক্ষেত্রেই ইমেজ কোয়ালিটি হ্রাস পেয়েছে।

যে পদ্ধতিটি এই স্বচ্ছ ও পরিষ্কার ছবি তৈরী করে তা হঠাৎ করেই গঠিত হয়েছে বলে বিবর্তনবাদীগণ দাবী করেন। এখন যদি কেউ আপনাকে বলেন যে আপনার কক্ষের টেলিভিশনটি আকস্মিক সম্ভাবনার একটি ফলাফল, এর সমস্ত পরমাণুগুলো হঠাৎ করেই এক সঙ্গে আসতে লাগল আর ইমেজ তৈরী করার এই যন্ত্রটি তৈরী করল, আপনি কি ভাববেন ? হাজারো লোক যা পারে না, তা কিভাবে পরমাণুগুলো সম্পন্ন করতে পারে ?

যে যন্ত্র চোখের তৈরী ছবির তুলনায় সাদামাটা সেকেলে ছবি তেরী করে তা যদি যুগপৎ সম্ভাবনায় তৈরী না হতে পারে তাহলে এটা অত্যন্ত স্পষ্ট যে, চোখ এবং চোখ দ্বারা দৃষ্ট ছবি হঠাৎ করেই সৃষ্টি হতে পারতো না। কানের বেলায়ও একই পরিস্থিতি খাটে। বহিঃকর্ণ অরিকলের মাধ্যমে শব্দ

গ্রহন করে তা মধ্যকর্ণের দিকে পরিচালিত করে; মধ্যকর্ণ শব্দ কম্পনকে আরো তীব্রতর করে অন্তঃকর্ণে প্রেরণ করে; অন্তঃকর্ণ এই শব্দ কম্পনগুলোকে বৈদ্যুতিক সিগন্যালে পরিণত করে মস্তিস্কে পাঠায়। ঠিক চোখের মতোই মস্তিস্কের- শ্রবণ কেন্দ্রে শ্রবণ কাজটি সম্পন্ন হয়।

চোখের পরিস্থিতিটি কানের বেলায়ও সত্য। অর্থাৎ ব্রেইন যেমন শব্দ থেকে সংরক্ষিত, ঠিক তেমনি করে আলো থেকেও সংরক্ষিত : কোন প্রকার শব্দকে তা ভেতরে প্রবেশ করতে দেয় না। সুতরাং বহির্জগৎ যতোই কোলাহলপূর্ণ হোক না কেন, মস্তিস্কের- ভেতরভাগে সম্পূর্ণ নীরবতা বিরাজ করে। তথাপি তীক্ষ্নতম শব্দগুলো মস্তিস্কের- ভেতরেই উপলব্ধি করা হয়। শব্দ থেকে সংরক্ষিত আপনার এই মস্তিস্কে আপনি শুনতে পান অর্কেষ্ট্রার ঐকতান আর জনবহুল জায়গার সমস্ত শব্দই আপনার মস্তিস্ক শ্রবণ করে। অবশ্য যদি ঠিক সেই মুহূর্তে কোন সঠিক যন্ত্র দিয়ে আপনার মস্তিস্কের- শব্দ মাত্রা মেপে দেখা হতো তবে দেখা যেতো যে ঐ এলাকায় পূর্ণ নীরবতা বিরাজ করছে।

ঠিক চিত্রকল্পের বেলায় যেমনটি হয়েছে, তেমনি মূল শব্দের ন্যায় যথাযথ শব্দের উৎপাদন আর পুণরুৎপাদনের চেষ্টায় দশক দশকের সাধনা ব্যয় করা হয়েছে। এ সমস্ত প্রচেষ্টারই ফলাফল হলো- সাউন্ড রেকর্ডার, হাই ফাই আর শব্দের অর্থ বুঝার সিস্টেম। সমস্ত টেকনোলজীর প্রয়োগ, আর এই প্রচেষ্টায় সহস্র সহস্র ইঞ্জিনিয়ার আর এক্সপার্টগণ কাজ চালিয়ে যাওয়া সত্বেও মানুষের- কান দিয়ে শ্রুত শব্দের সমান তীক্ষ্নতা ও স্পষ্টতাসম্পন্ন শব্দ তৈরী করা সম্ভব হয়ে উঠেনি। মিউজিক ইনডাষ্ট্রিতে সবচেয়ে বৃহৎ কোম্পানিগুলোর তৈরী সবচেয়ে উঁচু মানের গুণসম্পন্ন হাইফাইগুলোর কথা ভাবুন । এমনকি এই যন্ত্রগুলোয় যখন শব্দ রেকর্ড করা হয় তখন শব্দের কিছু গুণ হারিয়ে যায়; কিংবা যখন আপনি হাইফাই টি অন করেন, তখন মিউজিক শুরু হওয়ার আগে হিস্ হিস্ শব্দ শুনতে পাবেন। যাই হোক, মানব দেহের টেকনোলজীর মাধ্যমে উৎপন্ন শব্দগুলো অত্যন্ত তীক্ষ্ন আর পরিষ্কার। মানুষের কান কখনো শব্দ শোনার সময় হাইফাই এর মতো হিস্ হিস্ শব্দ কিংবা আবহতড়িৎ জনিত পট্ পট্ শব্দ শোনে না; মানুষের কান শব্দটি

স্বাভাবিকভাবে যেমন ঠিক তেমনিরূপে শুনে থাকে, ঠিক তেমনি তীক্ষ্ম আর স্বচ্ছ। মানুষের জন্ম লগ্ন হতে এটা এমনিভাবেই হয়ে আসছে।

এ পর্যন্ত, সেন্সরি ডাটা উপলব্ধির ব্যাপারে মানুষের কান ও চোখ যেমন সুবেদী (সুক্ষ্ম পরিবর্তন ধরতে সক্ষম) আর সফল, মানুষ তেমনতর কোন দৃষ্টি সম্বন্ধীয় কিংবা কোন রেকর্ডিং যন্ত্র তৈরী করতে সক্ষম হয়নি।

যাই হোক, দর্শন আর শ্রবণের ব্যাপারে সমস্ত কিছুর বাইরেও এক বিরাট সত্য নিহিত রয়েছে ।

## যে চেতনাটি দর্শন ও শ্রবণ করে থাকে- সেটি কার ?

মস্তিস্কের ভেতর কে মোহময় পৃথিবী দর্শন করে, কে শোনে ঐকতান আর পাখির কিচির মিচির, আর কেইবা গোলাপের সুবাস নেয় ?

মানুষের চোখ, কান আর নাক থেকে আগত উত্তেজনা বা উদ্দীপনা ভ্রমন করে বৈদ্যুতিক রাসায়নিক স্নায়বীয় তারণা হিসেবে মস্তিস্কে গিয়ে পৌছে। কিভাবে মস্তিস্কে এই ইমেজগুলো তৈরী হয় এ সম্পর্কে বহুবিধ বর্ণনা আপনি বায়োলজী, ফিজিওলজি আর বায়োকেমিষ্ট্রি বইতে খুঁজে পাবেন। কিন্তু আপনি কখনও এ বিষয়টি সম্পর্কে একটি গুরুত্বপূর্ণ সত্য খুঁজে পাবেন না : কে সেই জন যে মস্তিস্কে এই বৈদ্যুতিক রাসায়নিক স্নায়বীয় উত্তেজনাগুলোকে ছবি, শব্দ, ঘ্রাণ কিংবা স্নায়বীয় ঘটনা হিসেবে উপলব্ধি করে থাকে ? মস্তিস্কের ভেতরে একটি চেতনা থাকে, যে চোখ, কান, নাকের প্রয়োজনীয়তা ছাড়াই সমস্ত জিনিস উপলব্ধি করে থাকে। এই চেতনাটি আসলে কার ? কোন সন্দেহ নেই যে, এটি মস্তিস্ক গঠনকারী নার্ভ বা স্নায়ু, চর্বি স্তর কিংবা স্নায়ু কোষের নয়। এ কারণেই ডারউইন সমর্থক বস্তুবাদীগণ- যারা সবকিছু বস্তু দিয়ে তৈরী বলে বিশ্বাস করেন, তারা কখনও এই প্রশ্নগুলোর উত্তর দিতে পারেন না।

এই সচেতনতাবোধটি আসলে আত্মা বা স্পিরিটের- যাকে আল্লাহ তাআলা সৃষ্টি করেছেন। ছবি দেখার জন্য আত্মাটির চোখ লাগেনা কিংবা শব্দ শুনতে কানের দরকার পড়ে না। উপরন্ত, চিন্তা ভাবনা করতে তার কোন মস্তিস্কের- দরকার হয় না।

যিনিই এই স্পষ্ট ও বৈজ্ঞানিক সত্যটি পড়বেন, তারই উচিত হবে আল্লাহ সম্পর্কে চিন্তা করা, তাঁকেই ভয় করা, আর তারঁই কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করা। তিনিই মস্তিস্কের- মাত্র কয়েক ঘন সেন্টিমিটার আয়তনের আলকাতরা কালো জায়গটিতে সমস্ত বিশ্ব ব্রহ্মান্ড কে ত্রিমাত্রিক, বর্ণিল, ছায়াময় আর আলোকোজ্জ্বল রূপে সংকুচিত ও ছোট করে আনেন ।

## বস্তুবাদী বিশ্বাস

এতক্ষণ আমরা যে তথ্য উপস্থাপন করেছি, তা আমাদের দেখিয়ে দিচ্ছে যে, বিবর্তন থিওরী এমনি একটি দাবী, যার সঙ্গে বৈজ্ঞানিকদের পাওয়া তথ্যের স্পষ্টভাবেই কোন সাদৃশ্য নেই। প্রাণীর উৎপত্তি সম্পর্কে থিওরীটির দাবী বিজ্ঞানের সঙ্গে অসামঞ্জস্যপূর্ণ, এর প্রস্তাবিত বিবর্তনের পদ্ধতিগুলোর বিবর্তন ঘটানোর কোন ক্ষমতাই নেই, আর ফসিলগুলো প্রমাণ করছে যে, মতবাদটির জন্য প্রয়োজনীয় অন্তর্বর্তীকালীন আকার বা গঠনের কোন প্রাণী কখনও বিদ্যমান ছিল না; তাই বিবর্তন থিওরীকে অবৈজ্ঞানিক ডাটা বলে পরিত্যাগ করাই বাস্তব । এমনভাবে তা করা উচিত যেমনভাবে সমগ্র ইতিহাস জুড়ে পৃথিবী কেন্দ্রিক বিশ্বব্রহ্মান্ডের মডেলটি বিজ্ঞানের আলোচ্য সূচী হতে বাদ দেয়া হয়েছে ।

*কিন্তু তবুও বিজ্ঞানের আলোচ্যসূচীতে বিবর্তন মতবাদকে সাগ্রহেই বহাল রাখা হচ্ছে। কিছু কিছু লোক এমনকি থিওরীটির সমালোচনা গুলোকে "বিজ্ঞানের প্রতি আক্রমন" হিসাবে উপস্থাপনার প্রয়াস চালায় । কিন্তু কেন?*

কারণটি হলো, বিবর্তন মতবাদ একই সূত্রে গাঁথা (একই মতালম্বী) কিছু লোকের জন্য একটি অত্যাবশ্যকীয় অন্ধ বিশ্বাস। এরা অন্ধভাবে বস্তুবাদ দর্শনের অনুরক্ত, আর তারা ডারউইনবাদকে এজন্য সমর্থন করে কেননা এটাই একমাত্র বস্তুবাদী ব্যাখ্যা যা প্রকৃতিতে ব্যবহারের জন্য সহজেই পেশ করা যায়।

যথেষ্ট কৌতুহলের ব্যাপার যে, তারা আবার সময়ে সময়ে এ সত্যটি স্বীকারও করে থাকে। হার্ভার্ড ইউনিভার্সিটির একজন প্রখ্যাত জীন তত্ত্ববিদ, খোলাখুলি বিবর্তনবাদী হিসেবে পরিচিত,

রিচার্ড সি লিওনটিন স্বীকার করেছেন যে তিনি ."সর্বাগ্রে একজন বস্তুবাদী এবং তারপর একজন বিজ্ঞানী"। তিনি বলেন :

এটা এমন নয় যে, বিজ্ঞানের বিভিন্ন পদ্ধতি এবং প্রতিষ্ঠান আমাদেরকে এই ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য পৃথিবীর বস্তুবাদ ব্যাখ্যা গ্রহনে কোন ভাবে বাধ্য করেছে, বরং, উল্টো, পার্থিব জিনিসের প্রতি আমাদের নিজেদের প্রধান মোহ থাকার কারণে আমরা কিছু পরীক্ষা নিরীক্ষার সরঞ্জাম ও কিছু ধারণার সেট তৈরী করতে বাধ্য হয়েছি যেগুলো বস্তুগত ব্যাখ্যা প্রদান করে, তা যতোই হোক অন্তর্জ্ঞানের পরিপন্থী কিংবা যতোই ধাঁধাঁ লাগানো হোক তা অদিক্ষীতদের জন্য- তাতে আমাদের কোন মাথা ব্যাথা নেই। অধিকন্তু বস্তুবাদই আসল ও সবকিছ, তাই আমরা আমাদের দোরগোড়ায় স্বর্গীয় পদচারণা মেনে নিতে পারি না।"[৪২]

এই সুস্পষ্ট বক্তব্যগুলো এটাই প্রমাণ করে যে, শুধুমাত্র বস্তুবাদ দর্শনে আসক্ত থাকার কারণেই ডারউইনবাদ নামক এক ধরণের অন্ধ বিশ্বাসকে জিইয়ে রাখা হয়েছে। এই বিশ্বাসটি এটাই বলতে চায় যে, "বস্তু ছাড়া আর কিছুর অস্তিত্ব নেই "। তাই এই মতবাদে তর্ক করে বলা হয় যে, "জড় ও অচেতন বস্তু থেকেই প্রাণের উৎপত্তি ঘটেছে" ।

পাখি, মাছ, জিরাফ, বাঘ, পোকামাকড়, বৃক্ষ, ফুল, তিমি ও মানবজাতি- এ ধরণের মিলিয়ন মিলিয়ন প্রজাতিসমূহ জড় পদার্থ থেকে বিভিন্ন বস্তুর মধ্যে পারস্পরিক ক্রিয়া- প্রতিক্রিয়া, যেমন বৃষ্টিধারা , বজ্রপাত ইত্যারি ফলস্বরূপ জন্ম নিয়েছে- এটাই জোর দিয়ে প্রচার করে যাচ্ছে মতবাদটি। এটা যুক্তি ও বিজ্ঞান উভয়ের পরিপন্থি এক ধরণের অনুশাসন। তথাপি, ডারউইনবাদীগণ এ মতবাদটি সমর্থন করেই যাচ্ছে যেন তাদের "দোরগোড়ায় স্বর্গীয় পদচারনা মেনে নিতে" না হয়।

যারা বস্তুবাদে পক্ষপাত নিয়ে প্রাণের উৎপত্তি বিষয়টির দিকে দৃষ্টিপাত না করবেন তারাই এই পরিষ্কার সত্যটুকু দেখতে পারবেন : সকল জীব একজন সৃষ্টিকর্তার সৃষ্টি কর্ম, যিনি সর্বশক্তিমান, সর্বজ্ঞানী এবং সবজান্তা। এই স্রষ্টাই হলেন আল্লাহ- যিনি অস্তিত্বহীন অবস্থা থেকে

বিশ্ব চরাচর সৃষ্টি করেছেন, এর ডিজাইন করেছেন অত্যন্ত নিখুঁতরূপে আর সকল জীবের আকার দিয়েছেন।

তারা বলল : আপনি পবিত্র। আপনি যা আমাদের শিখিয়েছেন তা ছাড়া আমাদের কোন জ্ঞান নেই নিশ্চয়ই আপনি প্রকৃত জ্ঞানময়, প্রজ্ঞাময়।

চৌদ্দশত বছর পূর্বে আল্লাহ সোবহানাল্লাহু তাআলা মানবজাতির পথচালিকা স্বরূপ কোরআন প্রেরণ করেছিলেন। এ স্বর্গীয় গ্রন্থখানা দৃঢ়ভাবে সমর্থন আর অনুসরণ করে মানবজাতি যেন সঠিক পথে পরিচালিত হয় এ আহ্বান করেছিলেন তিনি। নাযিল হওয়ার দিন থেকে শুরু করে শেষ বিচারের দিন পর্যন্ত এ স্বর্গীয় আর সর্বশেষ বইখানা মানবজাতির জন্য একমাত্র পথচালিকা হিসেবে থেকে যাবে।

পবিত্র কোরআনের অসমকক্ষ আর অতুলনীয় রচনাশৈলী এবং এর মাঝে বিদ্যমান প্রকৃষ্ট, গভীর ও বিস্তৃত জ্ঞানই সুনিশ্চিতভাবে প্রমাণ করে যে এটি মহান আল্লাহ তাআলার বাণী। এ ছাড়াও কোরআনের এমন বহু অলৌকিক বৈশিষ্ট্যাবলী রয়েছে যেগুলো প্রমাণ করে যে এটি পরম করুণাময় আল্লাহ তাআলারই নাযিলকৃত গ্রন্থ। এ সমস্ত গুণাবলী বা বৈশিষ্ট্যাদির একটি হলো অনেকগুলো বৈজ্ঞানিক যথার্থতা বা সত্যতা আজ থেকে ১৪০০ বছর আগেই কোরআনে উল্লেখ করা হয়েছিলআমরা সেদিন বিংশ শতাব্দীর প্রযুক্তিমালা দিয়ে আবিষ্কার বা সন্ধান যেগুলো কিনা- অবশ্যই কোরআন কোন বিজ্ঞান বিষয়ক গ্রন্থ নয়। কিন্তু- করতে সক্ষম হয়েছি। এরপরও বিজ্ঞান সংক্রান্ত বহু বিষয়াদি এ গ্রন্থটিতে অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত রূপে ও সারগর্ভ হিসেবে বর্ণিত রয়েছেযেগুলো - নোলজী বা প্রযুক্তির মাধ্যমে কেবল সেদিন মানব জাতির সমক্ষে উন্মোচিত বিংশ শতাব্দীর টেক হয়েছে। কোরআন যখন নাযিল হয়, সে সময় এ বিষয়গুলো ছিল অজানা, এটি আরো প্রমাণ করে যে কোরআন আল্লাহর বাণী।

## সূচীপত্রঃ